এখন ডুয়ার্স

ডিসেম্বর ২০১৮। ২০ টাকা

শিলিগুড়ি তুমি কার ?

চা-শিল্পে আখেরে ক্ষতিগ্রস্থ শিলিগুড়ি মহকুমা

আন্তর্জাতিক আঙিনায় শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি ঘিরে পর্যটন সার্কিট প্রস্তুত

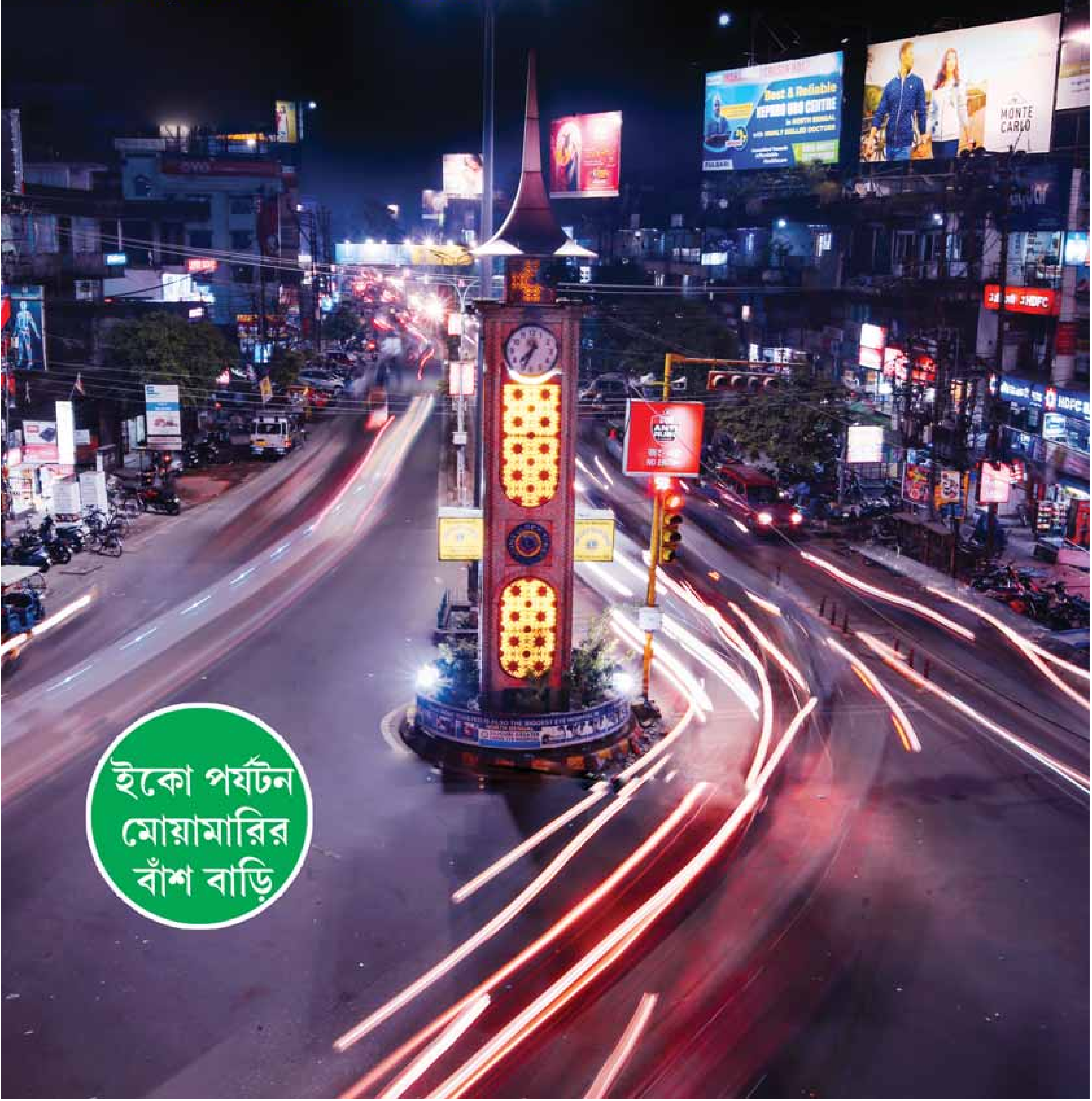

ইকো পর্যটন মোয়ামারির বাঁশ বাড়ি

জলপাইগুড়ি পুর এলাকায়

যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা শহরের নাগরিকদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে ১৩৪ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রাচীন পৌরসভার শিকড়টি শহরের গভীর থেকে গভীরের মাটি ছুঁয়ে এখনও সবুজ, এখনও দৃঢ়। শহরের উন্নয়ন, সংস্কার, সৌন্দর্যকরণ-এর সাথে সাথে সভ্যতা, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি ক্রমশই নানাভাবে এই শহরটিকে ধনবান করে তুলেছে এবং বাংলায় খ্যাতির শিয়রে পৌঁছে দিচ্ছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভায় বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলছে তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল—

১) এন ইউ এল এম— ১) শহরের গরীব মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভরদল গঠন।
২) স্বনির্ভর দলের ১.২৫ লাখ ক্যাশ ক্রেডিট ঋণপরিষেবা প্রদান।
৩) স্বনির্ভর দলের মহিলাদের ব্যক্তিগত ও দলগত ঋণ-এর ব্যবস্থা করা।
৪) শহরের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫) শহরের আশ্রয়হীনদের জন্য ১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা।

২) হাউসিং ফর অল (এইচ এফ এ)— ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ১২৯০টি গৃহ ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা (প্রতিটি গৃহের মূল্য) মূল্যের, পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ১৯৪৫টি পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হবে।

৩) আমরুত— ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তার জলকে পরিশ্রুত পানীয় জলের উপযোগী করে শহরবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। কান্তেষরী পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। জে ওয়াই এম এ পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণ করার কাজ চলছে।

৪) গ্রীন সিটি— ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের সবুজায়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে।

৫) এন ইউ এইচ এম— ইউ পি এইচ সি ১ (লাবন্য মাতৃসদন) এবং ২ (৩নং ঘুমটি) থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়।

৬) স্বাস্থ্যসাথী— এই প্রকল্পে ৭৫০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠির পরিবারকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। আরও ৩০০০ কার্ড প্রদান করা হবে। প্রতিটি পরিবারকে ১,৫০,০০০ টাকা স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করা হবে।

৭) সমব্যাথী— ৫২৯ টি পরিবারকে এককালীন ২০০০ টাকা করে পারলৌকিকক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

৮) পথবাতি— শহরের সৌন্দর্যায়ন ও আলোকিত করার জন্য ২৫ টি ওয়ার্ডে এল ই ডি লাইট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৯) রাস্তা ও ড্রেন— ২৫ টি ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তা ম্যাস্টিক ও ড্রেনকে কভার ড্রেনে পরিণত করার কাজ চলছে।

১০) এস ডব্লু এম— প্রতিটি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ চলছে। এর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি শহর— এই পৌরসভা আরও প্রগতিশীল ও সম্পন্ন হয়ে উঠুক। ধন্যবাদান্তে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ
সোমনাথ পাল

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৫

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শিলিগুড়ি তুমি কার? ৮

তরাইয়ে দেড়শ বছরের চা-শিল্পে আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত শিলিগুড়ি মহকুমা ১২

কঠিন বর্জ্যহীন শহরের নিজস্ব ভাবনা নিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় শিলিগুড়ি ১৫

উত্তরের জ্ঞানপীঠ ১৭

শিলিগুড়ি ঘিরে পর্যটন সার্কিট প্রস্তুত! ১৯

পাঠকের কলমে

সেই সব দিন রাত্তির ২৩

পর্যটন

মোয়ামারির বাঁশ বাড়ি ২৪

শ্রীমতি ডুয়ার্স

গর্ভস্থ শিশু পুত্র না কন্যা জানতে সায় দিলে আইনের চোখে অপরাধী গর্ভবতীও ২৬
নাট্যচর্চায় এক যুগ পেরিয়ে সম্পূর্ণ মেয়েদের একটি দল ২৭
আমার মেয়েবেলা ২৮

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং ৩০

উত্তরপক্ষ

অরণ্যকে বুকে আগলে পেট চালায় বনগ্রাম জয়ন্তি তবু কেন হতভাগ্যের শিকার? ৩৯

হাংরি রিপোর্টার

উত্তরের দৈনিকের দিনগুলি ছিল কঠোর পরিশ্রমের ৪১

প্রতিবেশি পিএনপিসি

কোচবিহার তার ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব-ঐতিহ্য রক্ষায় কতটা সক্ষম? ৪৩, শীতে সব্জি বাজার কাঁপাচ্ছে বিঘোরের বেগুন ৪৪, বইমেলায় বই বিকোয় কই? ৫৪

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

মহারাণী কথা ৩৩, লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬, রাসায়নিক রস ৪৬

BHUTAN PACKAGE TOUR 6 DAYS
Siliguri JN to Siliguri JN
DATE OF JOURNEY 31/12/2018

THIMPU, PUNAKHA, PARO, PHUNTSELING

RAJASTHAN PACKAGE TOUR 16 DAYS
(NCB/NJP- to NCB/NJP)
DATE OF JOURNEY 19/01/2019
06/10/2019

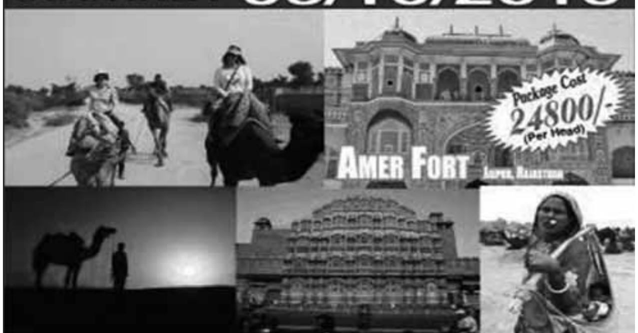

BIKANER, JAISALMER, AJMER, PUSKAR, MOUNT ABU, UDAIPUR, JAIPUR

HOLiDAYAAR
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri
M : 9434442866 / 9002772928
Phone : 0353-2527028
E-mail : holidayaar.nb@gmail.com

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্ত্বা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

সম্পাদকের কলমে

চালশেয় ঝাপসা বইমেলা প্রাঙ্গণ আঙ্গিকে তারুণ্য আনাটা বোধহয় জরুরি

চার দশক আগে সরকারি বইমেলার সূচনাকালে আসল উদ্দেশ্য মানুষের বই পড়ানোর অভ্যেস বাড়ানোর চাইতেও বেশি ছিল বোধহয় বইয়ের বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান। কত টাকার বই বিকিকিনি হল সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ ছিল বটেই, সেই সঙ্গে বইকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক সুস্থমনের সম্প্রদায়। বই কেনা এবং বই পড়া বা পড়ানোর পাশাপাশি বই পত্রপত্রিকা ঘিরে রোমাঞ্চ ও উন্মাদনা সৃষ্টি করাই ছিল বইমেলার আকর্ষণ ও সাফল্য। কিন্তু সমস্যাটা হল, নতুন শতাব্দী বইয়ের জন্য সম্ভবত খুব একটা সুখবর বয়ে আনতে পারে নি। নতুন মিডিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি থাকে বলাই বাহুল্য, অতএব টেলিভিশন বা অতঃপর ইন্টারনেট বই-ব্যবসার বারোটা দিয়েছে এই অভিযোগ কখনই পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ পাল্টা প্রশ্ন উঠবে, ইংরাজি বা অন্যান্য অনেক ভাষার বই তাহলে হাজার হাজার কপি বিক্রি হয় কী করে? সেসব দেশে টেলিভিশন বা নেট তো আমাদের অনেক আগেই এসেছে! যদি অভিযোগ ওঠে সাহিত্যের পাঠক ভীষণ কমে যাচ্ছে তাই গল্প উপন্যাসের বই বা পত্রিকা বিক্রি হয় না, তবে পাল্টা প্রশ্ন উঠতেই পারে, ইংরেজি বা হিন্দি পেপারব্যাক বিক্রি আজও কমে নি কেন? বাংলাদেশে আজও বই-পাইরেসি ব্যবসার রমরমা কেন? এর উত্তরে কেউ হয়ত বলবেন এই বাংলায় লেখার মান নিম্নগামী তাই পাঠক নেই। কেউ বলবেন এপারের বাঙালী চিরকালই গল্পের বই বা পত্রিকা এর-ওর কাছে বা লাইব্রেরি থেকে ধার করে পড়েছে, কিনে পড়বার অভ্যেস জন্মায় নি। কেউ বা যুক্তি দেবেন নতুন প্রজন্মকে বাংলা পড়তে শেখাই নি আমরা, পাঠক্রম থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার ফলশ্রুতিতে ইংলিশ মিডিয়াম রাজত্বের আশাতীত কুপরিণাম এই হয়।

অযথা রোমান্টিক হয়ে লাভ নেই, প্রকৃত বাস্তব হল, আমাদের একসময়ের অত্যধিক রাজনীতি-চর্চা এবং সময় থেকে মুখ ফিরিয়ে তত্ত্ব-য় আটকে থাকার অন্ধত্ব আজ বোধহয় ভোগবাদের উঠোনে হোচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাজনীতি-সর্বস্ব ভাবনা আমরা ছাড়তে পারি নি অভ্যেসের জেরেই, কিন্তু সেই রাজনীতির নতুন স্বাদ বিদঘুটে ঠেকছে, মেনে নিতে পারছে না আমাদের ইন্দ্রিয়। ফলে হতাশা আমাদের চেতনাকে গ্রাস করেছে, সৃজনশীলতা আটকা পড়ে গিয়েছে নাব্যতাহীনতায়। ভাল সৃষ্টি বা তার সমঝদার আশা করা এসময় সত্যিই কঠিন। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতার বেড়াজাল আমাদের আটকে দিয়েছে, বাইরের দুনিয়ায় কী লেখা বা আঁকা হচ্ছে জানবার উপায় নেই সবার। তাই একে যতই আমরা মধ্যমেধার শাসনকাল বলি না কেন, আমরা সবাই সেই একই শ্রেণীর মধ্যেই পড়ি, নিজেদের অহেতুক জ্যোতিষ্ক বা উল্কাগোছের কিছু না ভাবাই শ্রেয়।

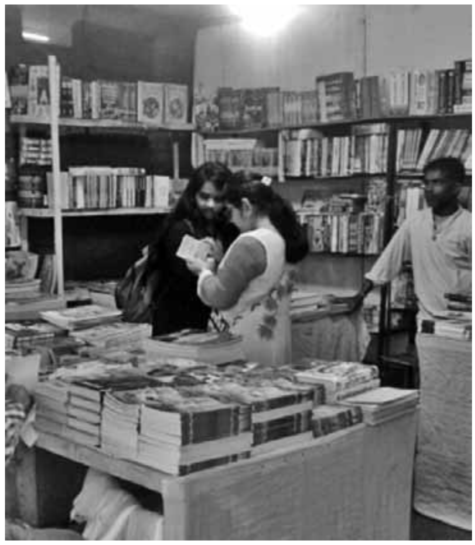

চল্লিশ বছর আগের কথা ছেড়ে দিন, এমনকী দশ-বারো বছর আগেও যে পাঠক-দর্শকের সমাগম হত তার চরিত্র বদলে গেছে অনেকটাই। সোশ্যাল মিডিয়ার হুজুগে জমানায় নতুন প্রজন্মের পাঠক তৈরি করা কি খুব কঠিন কাজ? কিন্তু বইমেলাকে সাজাতে হবে তাদের মনের মত করে। ক'জন কিশোর-কিশোরী কাঠখোট্টা মার্কা বুড়োদের এই মেলায় এসে মজা পেতে পারে বলুন তো? যেমন কেরিয়ার তৈরির বইপত্রের সঙ্গে তাদের কি ফ্রি-তে দেওয়া যায় না দিশি-বিদিশি ক্লাসিকগুলির সস্তা পেপারব্যাক?

ফলত যা হওয়ার তাই হচ্ছে। বইমেলার উদ্বোধনে আজ স্টার কবি-সাহিত্যিকের আকাল, আনতে হচ্ছে রূপালি পর্দার স্টার অভিনেতাকে। কিংবা মঞ্চে উঠে হাসিমুখে বই প্রকাশ করছেন যে রাজনীতির কারবারি তিনি তাঁর ইস্কুল বা কলেজের শেষ পরীক্ষার পরে আার কোনও বই কিনেছেন কিনা বা বইয়ের কয়েক পাতা পড়েছেন কিনা তা নিয়ে বোধহয় বাজি ধরা যায়। বইমেলাকে কোলাহলমুখর রাখতে সাংস্কৃতিক মঞ্চের ভাবনা হয়েছিল সেকালেই, কিন্তু হায়, সেই 'সংস্কৃতি' যে একদিন অত্যাচারী রাক্ষসরাজের মত বইকেই মেলা থেকে উৎখাত করে দেবে তা কি সেই আমলে বইমেলা পকিল্পনাকারীরা ভেবে দেখেছিলেন? হিমেল সন্ধ্যায় সে মঞ্চে ইংরাজি ইস্কুলের ঝলমলে কিশোরীরা নেচে নেচে গাইছে 'বিজলি গিরাকে ম্যায় হু আই হাওয়া হাওয়াই', ভিড়ে ঠাসা দর্শক হইহই করছে উল্লাসে, আর সারি সারি বইয়ের স্টলে শুকনো মুখে বইয়ের দোকানিরা বসে দু-চারটি খদ্দেরের আশায়— স্টলের খরচটা তো অন্তত তুলতে হবে!

রাজনীতির যে মহাপুরুষেরা এখনও বইমেলাকে 'ইজ্জতদার ইভেন্ট' বলে ভাবেন তাঁদের বলি, চালশে পড়া বইমেলার এই ফর্ম্যাট এবার পাল্টান স্যর। চল্লিশ বছর আগের কথা ছেড়ে দিন, এমনকী দশ-বারো বছর আগেও যে পাঠক-দর্শকের সমাগম হত তার চরিত্র বদলে গেছে অনেকটাই। সোশ্যাল মিডিয়ার হুজুগে জমানায় নতুন প্রজন্মের পাঠক তৈরি করা কি খুব কঠিন কাজ? কিন্তু বইমেলাকে সাজাতে হবে তাদের মনের মত করে। ক'জন কিশোর-কিশোরী কাঠখোট্টা মার্কা বুড়োদের এই মেলায় এসে মজা পেতে পারে বলুন তো? যেমন কেরিয়ার তৈরির বইপত্রের সঙ্গে তাদের কি ফ্রি-তে দেওয়া যায় না দিশি-বিদিশি ক্লাসিকগুলির সস্তা পেপারব্যাক? যদি মেনেও নিই, মনোরঞ্জনের জন্য এই জমানায় বই স্মার্টফোনকে টেক্কা দিতে পারবে না, তবু স্রেফ সময়ের দলিল হিসেবেই বই তো এখনও বিকল্পহীন। অতএব যে করেই হোক বইয়ের গুরুত্ব বাড়াতেই হবে। শুধু লাইব্রেরির বিক্রিতে প্রকৃত প্রকাশনীর ব্যবসায় উনুন জ্বললেও ভাত সেদ্ধ হয় না, ভরসা সেই খুচরো কাউন্টার সেল। বরং ডিসকাউন্ট বাড়ালে খুচরো বই বিক্রি বাড়ে, সে ডিসকাউন্টটুকু প্রকাশককে পুষিয়ে দিতে অসুবিধে কোথায় সরকারের? ভাতা-ভরতুকির রাজনীতিতে ক্লাব বা নাট্যদলগুলি সরকারি অনুদানে রমরমিয়ে পুজো বা নাট্যোৎসব করে, প্রকাশককে ভরতুকি দেওয়া চালু করলে কি ঘটিবাটি বেচে দিতে হবে?

আর সবচেয়ে বড় কথা হল, বই না থাকলে আপনাদের 'গৌরবগাথা' আপনাদের নাতিপুতির পরের প্রজন্ম জানবে কী করে বলুন?

খুচরো ডুয়ার্স

সুরাশুঁড়

ভাবিতেছিলাম, ডুয়ার্সে শীত গীত গাহিতে শুরু করিয়াছে। বানারহাটে বন্ধুর বাড়ি যাইয়া জর্মন কম্বলে চাপা থাকিয়া জয় শ্রীরাম জপিব। চাট না থাকিলেও চলিবে। কিন্তু বন্ধু কহিল, আসিয়াছ ভালো কথা। কিন্তু বানারহাটে রাম বাড়ন্ত। কেবল রামের কথাই কহি কেন — সুরাই বাড়ন্ত। শুনিয়া বলিলাম, তা কি হয়? গর্মেন্ট গ্রামে গ্রামে সুরালয় খুলিতেছে। সুরা সব গেল কই?

তখন সে যাহা বলিল শুনিয়া চিন্তা হইল বৈ কি! সুরা নাকি হাতি আসিয়া শুঁড় বাড়াইয়া পান করিয়া চলিয়া যাইতেছে! এতকাল তাহারা গেরস্তের ধান খাইত, ভুট্টা খাইত। মিড ডে মিলও মারিয়া হেডমাস্টারের হিসাব গুলাইয়া দিত। ইদানিং তাহারা সুরাপান করিতে বানারহাট আসিতেছে। তা হাতিদের সুরাপান বলিয়া কথা। তাহাদের কি দু-চার পেগে শান্তি হয়? নিপ-হাফ-ফুল কি তাহারা জানে? শুঁড় বাড়াইয়া চুমুক মারিলেই সপ্তাহের স্টক ফিনিশ! তল্লাটের সেরা মাতাল একমাসে যা খাইয়া থাকে, হাতির বাচ্চারা এক চুমুকে তাহার দ্বিগুণ খায়। এরপর বানারহাটে সুরা থাকে কোন হিসাবে? আরও শুনিলাম কোন এক বাইসনও নাকি বিলিতি ঘাস ভাবিয়া সুরাপূর্ণ পলিপ্যাক চিবাইয়া সারা রাত দেয়ালে গুঁতা মারিয়াছে।

ইহার পর বানারহাটে থাকে কোন পাগল? সুরাক্রান্ত হইতে শুঁড়াক্রান্ত হইবার ঝুঁকি কে নিবে? মহাতামাক ঢের ভাল।

জ্যামাইবাবু

কলিকা সমিতিতে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু লোক কই? কেবল গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালক ঘোঁতনবাবু একা বসিয়া নাটকের পার্ট মুখস্থ করিতেছেন আর ছিলিম টানিতেছেন। কহিলাম, বাকি সব গেল কই? সে কহিল, ময়নাগুড়ি বরযাত্রী যাবে।

রাগিয়া বলিলাম, সে তো সায়ংকালে। ভর দুপুরেই গেল নাকি?

সে বলিল, না যাইয়া উপায় কি। তিস্তা সেতুতে যে জ্যাম লাগিয়াছে — গাড়ি চলে কী ভাবে? হাঁটিয়া যাইতে হবে। কাল কী হইয়াছে শুনেন নাই?

অতঃপর সে যাহা বলিল তাহা নিম্নে লিখিতেছি—

ধূপগুড়ির কালীর হাট গ্রামের কে জানি সাতপাকে বাঁধা পড়িবে বলিয়া সাজিয়া-গুজিয়া চকচকে গাড়ি লইয়া রায়গঞ্জ যাইতেছিল। পথে পড়িল তিস্তা সেতু। সেইখানে গাড়ির মিছিল দেখিয়া চক্ষুস্থির! এ তো জ্যোতিবাবুর আমলে লাল ঝান্ডা কিংবা হাল আমলে শহীদ দিবসের মিছিল। শুধু পাব্লিকের বদলে গাড়ি। বরযাত্রীরা কহিল, জ্যাম কাটিবার জন্য ওয়েট করিলে লগ্ন তো ভগ্ন হইবেই, এমন কি পাত্রের বয়সও বাড়িয়া যাইতে পারে। চুলের কলপ উঠিয়া সাদা বাহির হওয়াও অসম্ভব নহে! পাত্র এইসব শুনিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া বিস্তর হাটিয়া, ধুলা খাইয়া, গাড়ির ধোঁয়া মাখিয়া যখন উল্টা দিক থেকে ছুটিয়া আসা পাত্রীপক্ষের গাড়িতে উঠিল, তখন তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া ড্রাইভার কলার ধরে ধরে! শেষে হবু শ্যালকের বন্ধু ফোটো মিলাইয়া, বাপের নাম জিগ্যেস করিয়া, আধার কার্ড চেক করিয়া বন্ধুর জামাইবাবু বলিয়া মানিয়া লয়।

এমন নাকি প্রায়ই ঘটিতেছে। হাঁটিয়া জ্যাম বৈতরণী পাড় করা জামাইদের নাকি শ্যালিকারা জ্যামাইবাবু কহিতেছে, ফোর লেন না হওয়া পর্যন্ত কত জামাই জ্যামাই হইবে তা কে বলিতে পারে?

দুয়ারে জঞ্জাল

ঘোঁতনবাবুর কথায় টেনশন করিতেছি। এমন সময় বাজে গন্ধ নাকে আসিল। দেখিলাম, আলিপুরদুয়ার হইতে মহাতামাক লইয়া খগেশ খ্যাপা আসিয়াছে। গন্ধের কথা বলিতেই সে কাঁচুমাচু মুখে কহিল, আলিপুরদুয়ারে খুব জঞ্জাল জমিয়া আছে। তাহাই বোধহয় জুতায় লাগিয়াছিল। গন্ধ সেই কারণেই।

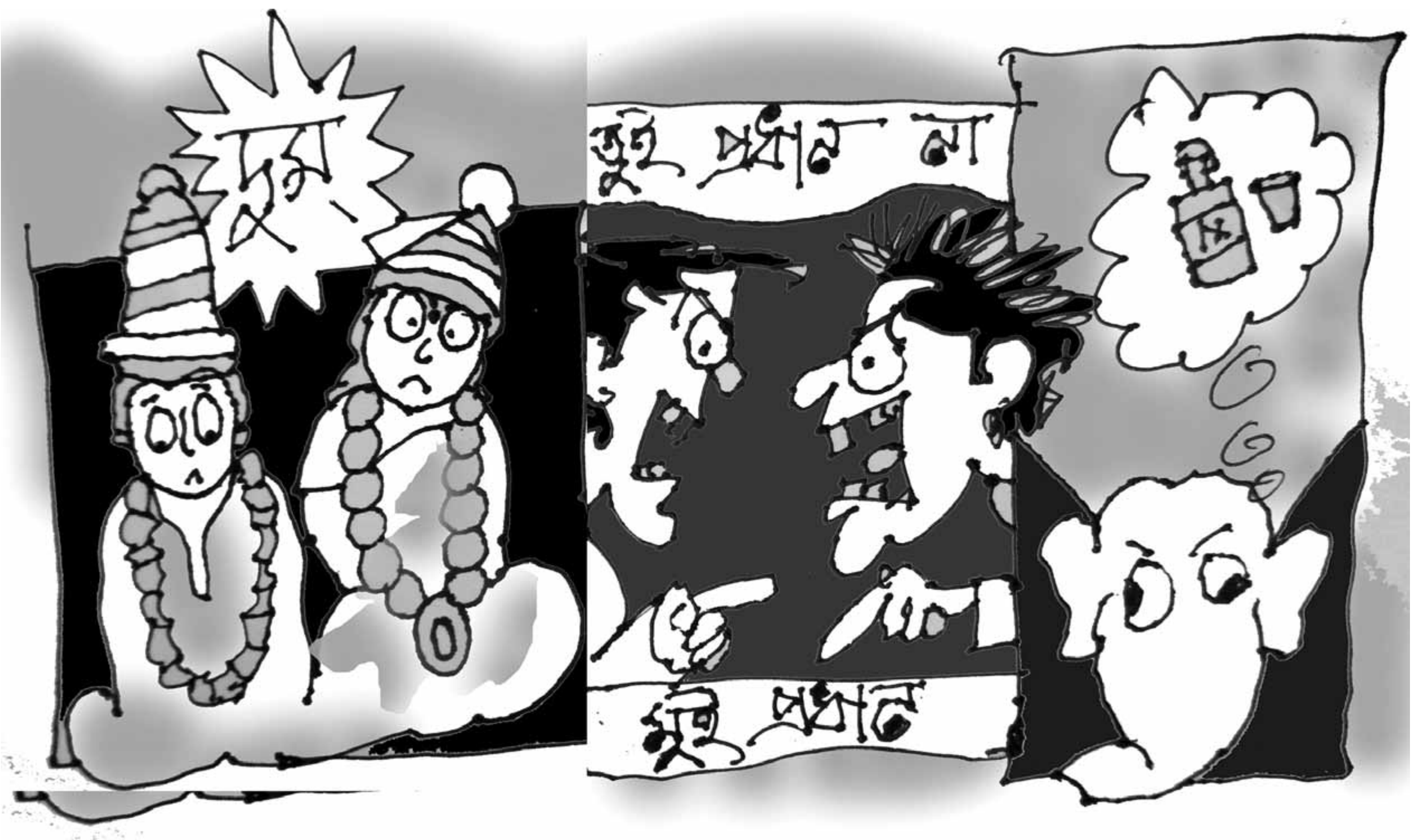

কহিলাম, জঞ্জাল সাফাই হইতেছে না?

সে জবাব দিল, 'কে করিবে? জঞ্জাল তো নিজে নিজে সাফ হইতে পারে না। তাহাই যদি হইল তবে জঞ্জাল হইবে কী ভাবে?'

'কাউন্সিলর নাই? আলিপুরদুয়ার তো মুন্সিপালিটি!'

'পুরসভা এক্সপায়ার করিবে। নতুন সভা আসিয়া নতুন জঞ্জাল সাফ করিবে। বিদায়ী কাউন্সিলরেরা বলিতেছে, জঞ্জাল সাফ করিলেও বিদায় লইতে হইবে, না করিলেও হইবে। তবে কেন খামোকা বেগার খাটিবে?'

খাঁটি কথা। মহাদিদি তো বলিয়াই থাকেন, আগের গম্মেন্ট দু-লাখ কোটি লোন রেখে গেছে। শুধতে শুধতে রাজকোষ ফাঁকা। তার মানে, আগের পুরসভা জঞ্জাল রাখিয়া গেছে। সাফ করিতে করিতে পুরকোষ ফাঁকা। তবে নতুন জঞ্জাল সাফ কী ভাবে হয়? সুতরাং, নতুন জঞ্জাল সাফ হইবে। পুরনো জঞ্জাল আগের মতই থাকিবে। মানে আলিপুরদুয়ারে জঞ্জাল হইল ধ্রুবক। এখন ভাবিয়া দেখ, নতুন সরাইয়া পুরাতন রাখিবে নাকি পুরাতন রাখিয়া নতুন সরাইবে।

ভাবিয়াছিলাম আলিপুরদুয়ারে গিয়া পিসির বাড়িতে দইবড়া খাইব। সে গুড়ে বালি। তখন ঘোঁতনবাবু কহিলেন, 'চালসার সংবাদ শুনিয়াছ?

সাইকেলেঙ্কারি

সেদিন নাকি চালসায় এক চা বাগানের কেউ সাইকেল চাপিয়া মনোরম আবহাওয়ার দুটি পাতা একটি কুঁড়ির মধ্য দিয়া কোয়ার্টারে ফিরিতেছিলেন— হেনকালে কেউ সাইকেলের পশ্চাতে উঠিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 'তুমি কে বাবা?' জবাবে দেখা গেল থাবা! তিনি রাগিয়া বলিলেন, 'ভাগ ভাগ!' দেখা গেল সেটা একটা বাঘ! নচ্ছার টাইপের এক চিতাবাঘ সাইকেলে উঠিয়া হালুম হালুম করিতেছে! যেন দৌড়াইয়া শিকার ধরিতে পারিতেছে না, তাই সাইকেল চাই। কী কেলেঙ্কারি! বাগানবাবু অবশ্যি কাবু হইবার পাত্র নন। তিনি অবাক হইলেও সবাঘ সাইকেল চালাইতে লাগিলেন। বাঘ খুশি হইয়া তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল। বাবুটি নতুন জ্যাকেটে বড়ি প্যাকেট করিয়াছিলেন ভাগ্যিস। চিতার পিঠ চাপড়ানি তাই চামড়া অবধি যাইতে পারিল না। শেষে চিতা যখন টের পাইল সাইকেল কোয়ার্টারের দিকে ছুটিতেছে, তখন নামিয়া পড়িল।

শুনিয়া ফের টেনশনে পড়িলাম। হাতি দারু খাইতেছে। বাইসন মাতাল হইতেছে। চিতা সাইকেল চড়িতেছে। ডুয়ার্সের হইল কী? একটা শনি পূজা না দিলেই নয়!

ফুলনীতি

সেদিন শুনিলাম লুকসানে কে জানি গাহিতেছিল, 'পদ্মফুলে ভ্রমর ভোলে/ এমন মধু তার/ এমন মধু তৃণের কাছে/ সেও মেনেছে হার'। গাহিতেই পারে। সেইখানে পঞ্চায়েত ফাইটে পাঁচ পাঁচটা পদ্মফুল ফোটার পরেও পঞ্চপান্ডব পদ্মমধু ছাড়িয়া তৃণমধু খাইয়াছে। জিরো বিরোধি পঞ্চায়েতে কে প্রধান হইবে, তাহা পরম শান্তিতেই নির্ধারিত হইবার কথা আছিল। কিন্তু শীতকালে শান্তির শীতল বারিধারা সিঞ্চন কাহার ভালো লাগে? তাই উত্তাপ আনিতে এমন ঘাসাঘাসি শুরু হইল যে পুলিশ আসিয়া কুল পায় না। ওইদিকে আবার কোনো এক কোতয়াল প্রধান বৈকুণ্ঠপুরে বলিয়াছে, নেতাগণ নাকি শিশুগণ সামলাইতে পারেন না। শুনিয়া সুগন্ধবাবু রাগিয়া-ফুলিয়া অস্থির। রাগিবার কথাই বটে! মিড ডে মিল খাইতে খাইতে শিশুরা যাহাতে মহাদিদির নাম স্মরণ করে, মহাদিদির পদ্য যাহাতে মুখস্থ করে, তাহার চেষ্টা কি অগণতান্ত্রিক? ইহাতে কি শৈশবের হানি হয়? অথচ পোড়ামুখো কোতোয়াল বলে কি না শিশুর প্রতি দায়িত্ব নাই? হ্যাঁ রে মেনিমুখো! চৌতিরিশ বছরে যখন শিশুরা রক্তমার্কা কাস্তে-হাতুড়ি টুপি পরিয়া চে গুয়েভারার চিত্রে চুমা খাইত, তখন তো কিছু বলতিস নে? যত্তসব! এই কারণেই বলি, ঘাসফুল হইতে ফুল বাদ দিয়া কেবল ঘাস খাইতে চাস নে! ফুলনীতি বোঝ!

তেলজিক

খবরের কাগজের সংবাদমূলক ছোট গল্প পড়িয়া জানিলাম ডুয়ার্সের হেথাহোথা খুব তৈলচুরি হইতেছে। তৈলপূর্ণ ট্যাঙ্কার হইতে চুপি চুপি তৈল চুরি করিয়া টু পাইস কামাইতেছে অনেকে। চুরি হইতেছে অনেক, ধরা পড়িতেছে নগণ্য। পড়িয়া ভাবিলাম, ইদানিং মহানেতা, মহাআমলা, মহাসভাপতি, মহাঅবজার্ভার যেমন ঘন ঘন ডুয়ার্সে আসিতেছে তাহাতে তৈল তো লাগিবেই। এমনিতেই তো তৈলমর্দনের যুগ তায় আবার শীতকাল। তৈল ঢালিয়া কামাইতে গেলে তৈল কিনিবে কী করিয়া? তাই তৈলচোরের সংখ্যা বাড়িতেছে। সামনেই বোরোলি ফ্রাই ডে, তিস্তাচর উৎসব, বাঙ্কুয়া মেলা, ইকো ডুয়ার্স শব্দবাজি দিবস— মোচ্ছবের অন্ত নাই। ভারি ভারি পদ পড়িবে। পদভারে ডুয়ার্স কাঁপিবে। পাদ্যঅর্ঘ্য দিবার জন্য তৈলই হইল সেরা। গম্মেন্টের তৈল গম্মেন্টের পায়ে ডলিবে, ইহাতে অপরাধ কী?

তারপর কৌতূহলবশতঃ ঘোঁতনবাবুকে জিগ্যেস করিলাম, 'ট্যাঙ্কার হইতে কেরোসিন-পেট্রোল চুরি হইতেছে। ওইসব কি কেউ কাহারো পায়ে মাখায়?'

উনি মহাতামাকে দম দিয়া জানাইলেন, 'কাজের জন্য মাখাইবে। কাজ না হইলে পায়ে দেশলাই কাঠি ফেলিলেই প্রম্পট অ্যাকশান।'

এইবার তেল সংক্রান্ত লজিক পরিষ্কার হইল। নোটবুক বাহির করিয়া ঝটপট নিউজিক্যাল পোয়েট্রিগুলি লিখিয়া ফেলিলাম—

১) কারা জানি ফেলে গেল/ খুচরো ভরা বস্তা জাতীয় সড়কের ধারে/ অন্ধকারে/ পুলিশ গুনিয়া দেখে পনের হাজার/ জলপাইগুড়ির নিকট।

২) যেতে পারে কিন্তু কেন যাবে হাতিদের পাল/ নক্সালবাড়ি হতে/ তাই ছোট ছোট গ্রুপে/ অতি চুপে চুপে/ করিতেছে খাড়া প্রশাসনিক চুল।

৩) পাহাড়পুরের কাছে/ বালিকা হিহি করে হাসে/ তাঁকে নাকি ধরিয়াছে ভূতে।

৪) আসিয়াছে অগ্রহায়ণ/ বিবাহ সিজন/ শোভাযাত্রায় ফাটিতেছে অসভ্য শব্দবাজি ডুয়ার্স জুড়িয়া/ হায়!

৫) দিনহাটায় খেলিছে শিশু/ বল ভাবি বোমা লয়ে/ অস্ত্র হাতে ফেবু পোস্ট দিয়া/ নেতা যায় গারদের দিকে।

৬) অসম সীমান্ত কাছে/ কে তুমি তুলিতেছ তোলা/ ভিনদেশি ট্রাক চালকের থেকে/ রাগিয়া বেগুন শুনি ঘাসফুল নেতা।

কলম সিং

ছড়া

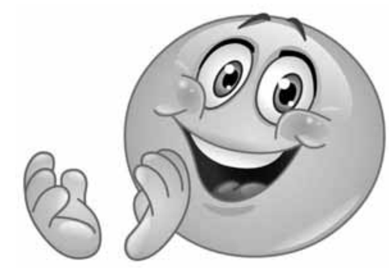

ইসকুল ইসকুল

ইসকুল ইসকুল শিশু দল কিলবিল
মাঠ জুড়ে খেলা করে পেট পুরে খায় মিল।

ব্যা ব্যা ব্ল্যাক বোর্ড চক আর ডাস্টার
মোটর বাইকে চেপে 'জিন' পরা মাস্টার।

হেড ফোন কানে গুঁজে দিদিমণি অল্প
মিঠে হেসে পিঠে রোদ জুড়েছে যে গল্প

চলো যাই রাসমেলা! খোলামেলা আব্দার
শালবনে পিকনিক কবে শুনি যাবে আর!

রোলকল ঘন্টা ভোঁ ভাঁ ক্লাসরুম
বই খাতা খুললে যে জব্বর পায় ঘুম!

গ্লাসে ভরে পান করি লাল ছেড়ে গ্রীণ টী!
ডিএ নাই গিয়ে তাই ক্লাসে আর হবে কী?

ছাত্রের ভারি ব্যাগ খালি করা দরকার,
মানিব্যাগ হালকা? মানব না সরকার!

শিক্ষা না শিক্ষক? নো কনফিউশন
ভোট নেই জেনে রেখো তুলে দিলে টিউশন!

ছন্দোপম বন্দ্যোপাধ্যায়

(ব্যঙ্গ ছড়া পাঠান। বিষয় সাম্প্রতিক সময়। ইমেল: editor.ekhonduars@gmail.com)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শিলিগুড়ি তুমি কার ?

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মূলত গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এসে জীবিকার সন্ধানে ভিড় করছে শিলিগুড়ি শহরে। আগে এখানকার রিক্সাচালকের ৯০ শতাংশ ছিল বিহারি। এখন ৯০ শতাংশ গ্রাম থেকে আসা রাজবংশী। এক সময়ের রক্ষণশীল পরিবারের রাজবংশী মহিলারা আজ বাঁচার প্রয়োজনে গৃহনির্মাণের যোগালী ও গৃহপরিচারিকার কাজে শহরে এসে জমা হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিত্যযাত্রী যাকে বলা হয় 'কমিউটার'।

শহরের নাম শিলিগুড়ি। 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'-এর মতন এই শহরের নামও রেখেছেন কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গের 'দ্বিতীয় কলকাতা', কারও কারও আদুরে ডাক 'উত্তরবঙ্গের রাজধানী'। তবে শিলিগুড়ির আরও নাম আছে। কেউ ডাকেন 'ভাও'-এর শহর। কারও কাছে এটি স্মাগলিং সিটি। কোনও কোনও বুদ্ধিজীবীর অভিধানে এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার। ১৯০১ সালে এর জনসংখ্যা ছিল ৭৮৪, আজ সাত লক্ষেরও বেশি। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৪৬.৮৩ শতাংশ। শুধু এই রাজ্যের অন্য শহরগুলির তুলনায় নয়, দেশের অন্য সব শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের থেকেও বেশি। কিন্তু এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে 'আমার শহর শিলিগুড়ি'— এই আবেগ বুকের মধ্যে ভরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার মানুষ কিন্তু খুবই কম।

এই শহর এখন ইট, বালু পাথরের কংক্রিটের শহর। শহরে ফাঁকা কোনও জায়গা নেই। অথচ এটাই কোনও শহরের ফুসফুস। নেই পার্কিংয়ের জায়গা। নেই জনসাধারণের জন্য শৌচালয়।

শিলিগুড়ির সমস্যা এখানেই। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর থেকে তাই কোনও ব্যক্তিত্ব রাজ্য রাজনীতির দ্বিতীয় ব্যক্তির খ্যাতি নিয়ে উপস্থিত হন নি। এক সময় অবশ্য এই শহরের অরুণ মৈত্র রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির আসন কিছুদিনের জন্য অলঙ্কৃত করেছিলেন। তবে সে সময় রাজ্য কংগ্রেসের মূল নেতৃত্বের লাগাম যাদের হাতে ছিল তারা সবাই ছিলেন গঙ্গার ওপারের বাসিন্দা। অরুণ মৈত্র ছিলেন কাগজ কলমে সভাপতি। সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের চাবি ছিল গঙ্গার ওপারের নেতৃত্বের হাতে।

অস্বীকার করার জায়গা নেই শিলিগুড়ি শহর বাড়ছে, কিন্তু এই বৃদ্ধির হার শিলিগুড়ির প্রকৃত স্বাস্থ্যবৃদ্ধি কি না তা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে বইকি।

শহর শিলিগুড়ি স্বপ্ন দেখে আগামী দিনে মহানগরীর উজ্জ্বল পোষাকে তার শতছিন্ন পোষাককে ঢেকে দিতে পারবে। তবু যে একটা আশঙ্কার ভ্রূকুটি এই সুখস্বপ্নের দরজায় উঁকি দিতে চায়। কারণ যে কোনও শহর গড়ে ওঠার পেছনে কিছু ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক কারণ থাকে। কলকাতা গ্রাম থেকে মহানগরীতে পরিণত হওয়ার পেছনে ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ শাসনের পটভূমি। জব চার্নকের প্রথম পদক্ষেপই এই মহানগরীর যাত্রার সূচনার কারণ ছিল তা নয়। তৎকালীন ভাগিরথীর নাব্যতা ও বাণিজ্যিক সুবিধার সঙ্গে শাসনের কেন্দ্র রূপে এই গ্রামকে রূপান্তরিত করেছিল নগর থেকে মহানগরীতে। ভৌগোলিক অবস্থান তাকে সুযোগ করে দিয়েছিল শিল্পনগরীর কৌলিন্যের পরিচয় পেতে। কোনও শহর গড়ে ওঠার পেছনে থাকে শিল্পের ভূমিকা। উদাহরণ শাল-মহুয়ার অনুর্বর ভূমিতে জামশেদপুর ইস্পাত নগরী। পশ্চিমবঙ্গেও একই কারণে গড়ে উঠেছিল দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পনগরী। কোনও কোনও শহর গড়ে উঠেছিল রেলওয়ের মতন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে— যেমন এই রাজ্যের খড়্গপুর, আসামের গৌহাটি তথা মালিগাঁও, উত্তরপ্রদেশের মোঘলসরাই ইত্যাদি। আবার একটি বড় শহরের লোকবসতির চাপ কমানোর জন্য গড়ে ওঠে উপনগরী, যেমন সল্টলেক, রাজারহাট নিউটাউন, নয়দা, ভুবনেশ্বর। তেমনি রয়েছে রাজতন্ত্রের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা পুরনো শহর। যেমন এ রাজ্যের কোচবিহার বা মালদা।

শিলিগুড়ি গড়ে ওঠার পেছনে কিন্তু এমন কোনও উপকরণ নেই। না আছে ঐতিহাসিক, না আছে শিল্প। এটা যে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা শহর। এখানেই আছে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া। কোনও শিশু যদি জন্মের পর উপযুক্ত পুষ্টি ছাড়াই ক্রমশ মেদবহুল 'স্বাস্থ্যের' অধিকারী হতে থাকে তবে তো তার ভবিষ্যৎ নিয়েই উপস্থিত হয় নানা দুশ্চিন্তা। ১৯০১ সালে ৭৮৪ জন জনবসতি নিয়ে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল সে ১০০ বছরের মধ্যে সাত লক্ষ জনবসতির নগরীতে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে গত একশ বছরের ঘটনাবলী দেখলে কিন্তু এই নগরীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি আঁকার প্রশ্নে একটা জোরালো প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়। তাই এর ইতিহাসের পাতাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও উল্টে দেখার প্রয়োজন আছে।

১৮৬৭ সালে ভুটান থেকে ডুয়ার্সকে হস্তগত করার পর পূর্ব ডুয়ার্সকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পশ্চিম ডুয়ার্সকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৬৭ সালে কালিম্পংকে দার্জিলিঙের সঙ্গে যুক্ত করে এই জেলাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। এক হ'ল সদর মহকুমা— তিস্তার উৎস পাড়ের পার্বত্য অঞ্চল ছিল এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। আয়তন ছিল ১৬০ বর্গ মাইল। অপর মহকুমার নাম ছিল তরাই মহকুমা। পাহাড়ের পাদদেশ নিয়ে গঠিত এই মহকুমার নাম ছিল তরাই মহকুমা। এর সদর দপ্তর ছিল আজকের ফাঁসিদেওয়ার গ্রাম হাঁসখাওয়া। শিলিগুড়ির নাম সরকারি নথি ছাড়া ছিল প্রায় অজ্ঞাত। সিকিম ও ভুটান থেকে ছিনিয়ে আনা বৃহৎ ভূখণ্ডের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আজকের এই শিলিগুড়ি অন্য অনেক গ্রামের ভিড়ে মিশে ছিল। এটি ছিল তখন জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর মৌজার একটি অখ্যাত গ্রাম।

শিলিগুড়ির কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। বিগত বাম রাজত্বকালে জব চার্ণকের পদার্পণকালকে কলকাতার জন্মক্ষণ ধরে নিয়ে তার তিনশ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয়েছিল। যদিও কলকাতার অস্তিত্ব এর অনেক আগে থাকতেই ছিল। আমাদের শ্বেত চামড়ার প্রতি তো একটা অনুরাগ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে থাকতে থাকতেই গড়ে উঠেছে। বামফ্রন্টের রাজত্বকালেই শিলিগুড়ির জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এখানেও যে সেই একই প্রশ্ন হাজির হচ্ছে। শিলিগুড়ির জন্মকাল কোনটি? ইতিহাসের কোন পাতা থেকে শিলিগুড়ির জন্মকাল নেওয়া হয়েছিল? ১৮৭৮ সালে যখন নর্থ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে মিটারগেজ লাইনকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল তখন পর্যন্ত শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি মৌজার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সে দিনটিকে শিলিগুড়ির জন্মের সূচনা বলে মনে করা যেতে পারে কি না তা ভেবে দেখা দরকার ছিল।

এই সময় ঘটে গেল ১৯৬২ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চিনা সেনাবাহিনীর আক্রমণ। ভারত ভাগের আগে পূর্ব বাংলার মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সোজা পথ বন্ধ হয়ে গেল। চিনা আক্রমণের পর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পৌঁছাবার জন্য শিলিগুড়ি তথা শিলিগুড়ি করিডোরের গুরুত্ব উপলব্ধি করা শুরু হল। এর সঙ্গে যাত্রা শুরু হল আধুনিক শিলিগুড়ির।

১৮৮১ সালে শিলিগুড়ি মৌজা সহ কিছু এলাকা জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করার পর পর তরাই মহকুমার সদরদপ্তর হাঁসখাওয়া থেকে সরিয়ে এনে শিলিগুড়িতে আনা হয়েছিল। সেটা তো কোনও শিশুকে তার উলঙ্গ অবস্থাকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে 'ভদ্র' ছেলেতে পরিণত করার মতন ঘটনা। তার সেই পোষাক পরাকে নিশ্চয়ই তার জন্মকাল বলে মনে করা যায় না। সেই সময়টাকে তার ভবিষ্যৎ যাত্রার সূচনা বলা হলে আপত্তি হবার কারণ থাকার কথা নয়, তবে তা কতখানি ইতিহাসগ্রাহ্য সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

১৯০৭ সালে তরাই মহকুমার অন্তর্গত কার্শিয়াং মহকুমাকে বিচ্ছিন্ন করে গঠন করা হয়েছিল শিলিগুড়ি মহকুমা। তাই শিলিগুড়ি বলতে শুধু শিলিগুড়ি শহরকেই বোঝাবে, না শিলিগুড়ি মহকুমাকে বোঝাবে সেটাও স্থির হওয়া দরকার।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯০১ সালের জনগণনায় শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল ৭৮৪। ১৮৩৮ সালে গঠিত হয়েছিল ইউনিয়ান বোর্ড, জর্জ মেবার্ট হয়েছিলেন তার সভাপতি। সে সময় এর জনসংখ্যা ছিল ৮৫৪১। ১৯৪৯ সালে ৮টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরসভা। হিলকার্ট রোডের এক ভাড়া বাড়িতে শুরু হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরসভার কাজ।

১৮৯৫ সালে ডি আই ফান্ডের হাটে (আজকের মহাবীর স্থানের পুরাতন বাজার) স্কট মিশন যে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেছিল সেটিই ছিল শিলিগুড়ির প্রথম বিদ্যালয়। ১৯০৭ সালে এখানে স্থাপিত হয়েছিল ডাকঘর।

আধুনিক শিলিগুড়ির সূচনাকাল বলা যেতে পারে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের স্বাধীনতার দিনটি থেকে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন দেশের মাটি থেকে বিদেশী শাসনের জোয়ালকে উচ্ছেদ করার জন্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশের শাসন ক্ষমতার আরাম কেদারায় বসে থাকা কিছু ক্ষমতালিপ্সু নেতাদের সুখের ইমারত গড়ার জন্য দেশের দুই প্রান্ত পূর্ব এবং পশ্চিমের দুই রাজ্য বাংলা এবং পাঞ্জাবের দুই অংশ পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাদের পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তুর পরিচয় লিপি ললাটে সেঁটে আছড়ে পড়েছিল সদ্য স্বাধীন ভারতের মাটিতে। পাঞ্জাব তার এই উদ্বাস্তু জনস্রোতের বন্যাকে প্রতিরোধ করেছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত ভারতে লোক বিনিময়ের মাধ্যমে। কেন্দ্রের সরকারও পাঞ্জাবের ধর্মীয় ভিত্তিতে এই লোক বিনিময়কে সমর্থন জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দু'হাত খুলে এগিয়ে এসেছিল।

পশ্চিমবাংলার 'প্রগতিশীল' নেতাদের সোনার পাথরের বাটির মতন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অপূর্ব নজির দেখা গেল এখানে। একদিকে ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে বাংলা বিভাজনকে সমর্থন জানাল। অপর পক্ষে পাঞ্জাবের মতন লোক বিনিময়কে আপত্তি জানিয়ে ঘোষণা করল তারা ধর্মীয় বিভাজনকে মানেন না। মজার কথা হল, এই সব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল নেতারা কিন্তু নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু শিবিরে ভিড় বাড়িয়ে চলেছিলেন। তারা ঘোষণা করতে পারেন নি, আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই, আমাদের পরিচয় মানুষ। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা যেমন আমাদের দেশ পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষও আমাদের দেশ। আমরা আমাদের জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যাব না!

এই প্রসঙ্গে এক খাসিয়া ট্যাক্সি চালকের মন্তব্যকে এখানে উপস্থিত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।

ঘটনাটি গৌহাটি থেকে শিলং যাওয়ার পথের ঘটনা। শিলং-এ ছিল এক আলোচনা সভা। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে গৌহাটি থেকে শিলং যাবার পথে খাসিয়া ড্রাইভারটি বোধহয় সব যাত্রীকেই অবাঙালি বলে ধরে নিয়েছিল। কারণ কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদ। খাসিয়া ড্রাইভারটি হঠাৎ মন্তব্য করে বলল, 'বাঙালি জাতটি বহুত ঘাটিয়া আছে স্যার।'

বাঙালি রক্তে ঘা লাগার কথা। তবু তাকে শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করা হল, 'বাঙালি সম্পর্কে তোমার এমন ভাবনা কেন হল'?

সে উত্তর দিল, 'দেখুন স্যার, এই বাঙালি হিন্দু বাঙালি আর মুসলিম বাঙালি বলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তাদের জন্মভূমি বাংলাকেই দু'ভাগে ভাগ করে নিল। আর তারা এখন এখানে এসে আমাদের সবাইকে এক হয়ে থাকার উপদেশ দিয়ে চলেছে।'

বাঙালি সম্পর্কে একজন সামান্য শিক্ষিত খাসিয়া গাড়ি চালকের এই মন্তব্যকে বিরোধিতা করার কোনও জোরালো যুক্তি কিন্তু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। তাই ফিরে আসা যাক দেশভাগের ফলে শিলিগুড়ি শহরের জনবিস্ফোরণের কথায়।

উদ্বাস্তু জনস্রোতের ধাক্কা বাঁধভাঙা জলপ্রবাহের গতি যেমন কোনও নির্দিষ্ট পথ মেনে চলে না তেমনই এই 'নতুন ইহুদি' উদ্বাস্তুর স্রোত শিলিগুড়ির বুকেও আছড়ে পড়েছিল। এরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। আর উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল মূলত পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত। এখানে ময়মনসিংহ, ঢাকা, দিনাজপুর ও ফরিদপুর থেকেই বেশি সংখ্যক মানুষ এসেছিল।

শিলিগুড়িতে নেই কোনও শিল্প। এখানে নেই কোনও উর্বর কৃষি জমি। নেই সেচ ব্যবস্থা। দেখা গেল শিলিগুড়ি শহরে গড়ে উঠল উদ্বাস্তু কলোনী। জীবিকা হিসাবে বেছে নিল গুমটি ঘরের ছোট ছোট দোকান। আজকের হিলকার্ট জুড়ে রিফিউজিদের গুমটি দোকান। শহরে নেই বৈদ্যুতিক আলো। ফুটপাতের দোকানে কুপির আলো, আর গুমটি দোকান ঘরে হ্যাজাকের ব্যবস্থা। যারা পূর্ব বাংলা থেকে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে আসতে পেরেছিল তারা রাজবংশীদের সরলতা ও দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদের জমিগুলিকে সস্তা দরে কিনে নিয়ে এই শহর থেকেই তাদের উচ্ছেদ করে তাদের অস্তিত্ব তথা সংস্কৃতিকেই প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিল।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান শিলিগুড়ির হাকিমপাড়াকে বলা হয় বনেদি পাড়া। এর পূর্ব নাম ছিল স্থানীয় রাজবংশী জোতদার রাজ রাজেশ্বরী জোত। এখন পর্যন্ত এখানে মূলত বাঙালি উচ্চ মধ্যবিত্তদের বাস। এখানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিবেকানন্দ হাইস্কুল। দু' বিঘা জমির উপর যে স্কুলটি গড়ে উঠেছে সেই জমিটি এক রাজবংশী শচীন্দ্রলাল সিং-এর দান করা জমি। বর্তমান দাম কাঠা প্রতি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। তিনি যখন জমিটি দান করেন তখন কথা ছিল বিদ্যালয়টির নাম হবে তার বাবার নামে 'দর্পনারায়ণ' স্কুল। হলও তাই। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে শচীন্দ্রলাল সিং-কে না জানিয়েই এই স্কুলের নাম পাল্টে হয়ে গেল বিবেকানন্দ স্কুল। এরকম উদাহরণ অসংখ্য। স্থানীয় অধিবাসীরা ক্রমাগত এই আগত জনস্রোতের চাপে শুধু যে তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে তা নয়, হারিয়েছে তাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং সর্বোপরি তাদের জাতিসত্ত্বার পরিচয়গুলিকে। ঠিকানাহীন হয়ে তারাই তো এখন আনাচে কানাচে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা নিয়ে তাদের সঞ্চিত অভিমানের বাষ্পকে উদ্গীরণ করে চলেছে।

ভারত ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে শিলিগুড়ি হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার। আগে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং মেল পূর্ব বাংলার পার্বতীপুর হয়ে শিয়ালদহে যেত। এতে অর্থ ও সময় উভয়ই বাঁচত। উভয় দেশের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা খুলে গেলে দেশের বাণিজ্য সামগ্রী বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে সরাসরি পৌঁছে যাবে। তখন একমাত্র যুদ্ধ ইত্যাদির মতন আপৎকালীন অবস্থা ছাড়া শিলিগুড়ি যে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার রূপে যে বাণিজ্যিক সুবিধা এখনও পর্যন্ত ভোগ করে তা কতখানি বজায় থাকবে তা কিন্তু ভাববার প্রয়োজন আছে।

এই সময় ঘটে গেল ১৯৬২ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চিনা সেনাবাহিনীর আক্রমণ। ভারত ভাগের আগে পূর্ব বাংলার মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সোজা পথ বন্ধ হয়ে গেল। চিনা আক্রমণের পর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পৌঁছাবার জন্য শিলিগুড়ি তথা শিলিগুড়ি করিডোরের গুরুত্ব উপলব্ধি করা শুরু হল। এর সঙ্গে যাত্রা শুরু হল আধুনিক শিলিগুড়ির।

একটি কথা রাজনৈতিক প্রভুদের কানে অপ্রিয় শোনা গেলেও যেটা সত্যি সেটা হল শিলিগুড়ি শহরের এই বৃদ্ধির পেছনে কোনও রাজনৈতিক নেতাদের কোনও ভূমিকা নেই। শিলিগুড়ির আপন গতিতেই নিজের প্রয়োজনেই এগিয়ে গেছে। ফলে শিলিগুড়ি যেমন এক অপরিকল্পিত শহর হিসাবে যেমন খুশি তেমন তার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করেছে তেমনই এখানে কোনও সর্বজন গ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি যাকে শিলিগুড়ির জননেতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অথচ পাশের শহর জলপাইগুড়ি কোচবিহারে কিন্তু অন্য ছবি, সেখানে আছে যেমন এক সমাজবন্ধনের আত্মীয়তা তেমনই আছে সর্বজন মান্য না হলেও সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা।

শিলিগুড়ি জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অন্য শহরগুলির তুলনায় অনেক দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শিলিগুড়ির জনসংখ্যা বেড়েছে যা রাজ্যের রাজধানী কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে বেশি। ওই সময়ে শিলিগুড়ি শহরে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছিল ১১ শতাংশ হারে। সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল এই শহরে বাসস্থানের অভাব। ফলে এই শহরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল অনেক বস্তি। অথচ এই শহরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাবে কোনও বস্তির অস্তিত্বর কথা স্বীকার করা হয়নি।

শিলিগুড়ি শহরের এই জনবসতিকে বলা যেতে পারে অর্থনীতির পরিভাষায় মাইগ্রেশন জনবসতি। এক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতি ১০০ জনে পূর্ব বঙ্গ থেকে এসেছিল ৬০ জন। বিহার থেকে এসেছে ১৭ শতাংশ। মাড়োয়ারি ৮ শতাংশ, বাকিরা এসেছে দক্ষিণবঙ্গ, আসাম ও অন্য প্রদেশ থেকে। এখন অবশ্য এই জনসংখ্যার অনুপাতের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। বহু বাঙালি পাড়ায় ক্রমশ অবাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে চলেছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মূলত গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এসে জীবিকার সন্ধানে ভিড় করছে শিলিগুড়ি শহরে। আগে এখানকার রিক্সাচালকের ৯০ শতাংশ ছিল বিহারি। এখন ৯০ শতাংশ গ্রাম থেকে আসা রাজবংশী। এক সময়ের রক্ষণশীল পরিবারের রাজবংশী মহিলারা আজ বাঁচার প্রয়োজনে গৃহনির্মাণের যোগালী ও গৃহপরিচারিকার কাজে শহরে এসে জমা হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিত্যযাত্রী যাকে বলা হয় 'কমিউটার'। দিনের আলো ফুটতেই এরা আসে শহরে। সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যাবেলা ফিরে যায়। এরা আসে কারণ এই শহরের আশপাশে কোনও বড় শহর বা কাজের সংস্থান না থাকায় শিলিগুড়ি শহরে কাজের সন্ধানে আসতে বাধ্য হয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে শিলিগুড়িতে আসা এই দৈনিক লোকের মধ্যে ৩১ শতাংশ আসে কাজের সন্ধানে। বাজার করতে আসে ১৫ শতাংশ। চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রয়োজনে আসে যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৮ শতাংশ। ১২ শতাংশ আসে নিছক ভ্রমণের জন্য। বাকি অংশ আসে নানা সামাজিক কাজের প্রয়োজনে।

শিলিগুড়ি শহরে মূলত এই জীবিকার তাগিদেই ঘটছে এই জনসমাগম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রয়োজন মেটাতে শিলিগুড়ি কতখানি সক্ষম? শিলিগুড়ির আপাত ঝকঝকে যে চেহারা মানুষকে এখানে আসার হাতছানি দিচ্ছে সেই শিলিগুড়ির হ্যালোজেন আলোতে উজ্জ্বল হিলকার্ট রোড, সেভক রোড বা বর্ধমান রোডই শিলিগুড়ির প্রকৃত রূপলাবণ্যের পরিচয় নয়।

দুর্গাপুর, কল্যাণী গড়ে উঠেছিল পরিকল্পিত শহর রূপে। শিলিগুড়ি এক অপরিকল্পিত শহর। দুর্গাপুর

গড়ে উঠেছিল ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করে। ফলে সেখানে গড়ে উঠেছে নানা সহায়ক শিল্প। পাশেই আসানসোল শিল্প নগরী। এর সঙ্গে আছে কয়লা খনি অঞ্চল। তাই এদের গ্রহণ ক্ষমতা শিলিগুড়ি থেকে অনেক বেশি। অথচ শিলিগুড়ি অভিমুখী জনস্রোত এদের থেকে বেশি।

কারণটা অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের রাজ্যের অভিভাবকেরা পশ্চিমবঙ্গকে এক নগরকেন্দ্রিক রাজ্য গঠনের মধ্যে রাজ্যের ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাদের চোখে হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনিপুর, ২৪ পরগনা এবং কলকাতাই যেন পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে যে আরও ভূখণ্ড আছে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এখানেও যে নানা পরিকল্পনা রূপায়ণের পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল সেই করণীয় কর্তব্যটি এই রাজ্যের অভিভাবকেরা আগেও করেন নি, এখনও করছেন না।

উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, ওড়িশা এমন কি আসামের মতন রাজ্যগুলিও এখন আর এককেন্দ্রিক রাজ্য রাজধানীর রাজ্য নয়। তারা অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে সেখানে গড়ে তুলেছে নানা নগরী তথা শিল্পকেন্দ্র। সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতে হয় দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পাঞ্জাব হয়েছিল বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। বাংলার যেমন কলকাতা, পাঞ্জাবের তেমন লাহোর। পাঞ্জাবীরা লাহোরকে হারিয়েছিল। এখানকার বাঙালিরা কলকাতাকে হারায়নি। পাঞ্জাবের শিল্পাঞ্চল তথা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি পড়েছিল পাকিস্তানের ভাগে। বাংলার শিল্পাঞ্চল পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ভাগে আর পাঞ্জাবের শিল্পাঞ্চল পড়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। লাহোরের পরিবর্তে পাঞ্জাব কিন্তু চণ্ডীগড়কে পায়নি। তাকে ভাগ করে নিতে হয়েছে হরিয়ানার সঙ্গে।

নবগঠিত পাঞ্জাবের কোনও জেলারই আধিপত্য নেই। পাঞ্জাব আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মূল তফাৎ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রভুরা যখন রাজধানী কলকাতা ও তার সংলগ্ন কয়েকটি জেলার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গকে দেখতে চেয়েছেন পাঞ্জাবের নেতারা তাদের নগরায়ণকে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৬৩.৫ শতাংশ বাস করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তাই রাজ্যের অভিভাবকেরা কলকাতার হাসিকে রাজ্যের হাসি বলে ধরে নেয়। যা কিছু অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড কেন্দ্রীভূত হয় এখানেই। ফলে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় প্রভুত্ব করেন এখানকার নেতারাই।

পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার ১৩.১২ শতাংশ বাস করে এই রাজ্যের বৃহত্তম নগরী লুধিয়ানাকে কেন্দ্র করে। এখানকার মানুষের এক শহরকেন্দ্রিক নির্ভরতা অনেক কম। ফলে রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনেই প্রতিটি নগরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মতন এখানকার জেলাগুলির অবস্থা প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতন নয়।

শিলিগুড়ি শহরকে বলা হয় এক রাস্তা কেন্দ্রিক শহর। হিলকার্ট রোড। হিলকার্ট রোডের যানবাহন ক্ষমতা বহনের সীমাকে অনেকগুণ ছাড়িয়ে গেছে। এক হিসাবে বলা হয়েছে এই রাস্তাটির বহন ক্ষমতা প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০টির মতন যান। আগে এই শহরটিকে বলা হত রিক্সার শহর। বেসরকারি হিসেব ছিল এই শহরের রিক্সার সংখ্যা ৫০,০০০। এখন টোটোর দাপটে শহরটির নতুন নাম হয়েছে টোটো শহর। টোটো-অটো রিক্সাই এখন রাস্তার মালিক। ট্র্যাফিক পুলিশ আছে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য। 'দুষ্টু' লোকের ধারণা, এরা যতখানি ডান হাত তুলে যান নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যস্ত তার থেকে ব্যস্ত বাঁ হাতে 'কিছু পেয়ে থাকিব' সংগ্রহকে পকেটে পুরতে।

এখানে নারী পুরুষের যে অনুপাত (প্রতি হাজারে ৭১৩) তা পশ্চিমবঙ্গের গড় অনুপাত তো বটেই সারা দেশের পুরুষ ও নারীর গড় অনুপাত থেকে অনেক কম। এর প্রধান কারণ এখানে বহু মানুষ জীবিকার কাজে আসে কিন্তু তাদের পরিবারকে সঙ্গে আনে না। তাই এদের রোজগারের সিংহভাগই চলে যায় এই শহরের বাইরে। শহরের প্রতি এদের মমত্ববোধ গড়ে ওঠে না।

ব্যবসানির্ভর শহর এই শিলিগুড়ির ব্যবসা অনেকটা ফাটকা বাজির মতন সাবানের বুদবুদের মতন, যে কোনও সময়ে ফেটে যেতে পারে। এর প্রতিফলন কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে। আসাম পর্যন্ত মিটার গেজ লাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার আগে শিলিগুড়ি শহরের মহাবীর স্থানের পাইকারী বাজারের যে রমরমা ছিল তাতে এখন ভয়ঙ্কর ভাটার টান দেখা যাচ্ছে। ব্রডগেজে বিভিন্ন সামগ্রী, বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে নামিয়ে ট্রাকে করে মহাবীর স্থানের গোডাউনে জমা করত। তারপর ট্রাকে করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হত। মাল বহনকারীর সংখ্যাই ছিল কয়েক হাজার। এখন ট্রাক ও সেই ট্রাক স্ট্যান্ড অদৃশ্য। সামগ্রী চলে যায় সরাসরি আসাম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। এমন কি ভুটানে সামগ্রী পাঠাবার জন্য শিলিগুড়ির তুলনায় ফালাকাটা ও ধূপগুড়িকে অনেক ব্যবসায়ী সুবিধাজনক বলে মনে করছে। মহাবীর স্থানের বাণিজ্যের এই সঙ্কোচনের ফলে ট্রাক, ঠেলা, কুলি, ছোট খাবার দোকান সর্বত্রই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে।

নবগঠিত পাঞ্জাবের কোনও জেলারই আধিপত্য নেই। পাঞ্জাব আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মূল তফাৎ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রভুরা যখন রাজধানী কলকাতা ও তার সংলগ্ন কয়েকটি জেলার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গকে দেখতে চেয়েছেন পাঞ্জাবের নেতারা তাদের নগরায়ণকে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৬৩.৫ শতাংশ বাস করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তাই রাজ্যের অভিভাবকেরা কলকাতার হাসিকে রাজ্যের হাসি বলে ধরে নেয়।

শিলিগুড়ির ব্যবসাকে বলা যেতে পারে ফ্লোটিং ব্যবসা। কারণ একে স্থায়িত্ব দিতে কোনও শিল্প তালুক এখানে গড়ে ওঠে নি। চাকুরির সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই জীবিকার তাগিদে বাড়িতে বাড়িতে গড়ে উঠছে পান, বিড়ি সিগারেটের মতন গুমটি ঘর। বহু ক্ষেত্রেই খরিদ্দারের অভাবে সেগুলি আবার অদৃশ্যও হয়ে যাচ্ছে।

এখানকার ব্যবসার চরিত্রগুলি দেখার মতন। খাদ্যশস্যের ব্যবসা মূলত মারোয়ারীদের হাতে। ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করে ১০-১২টি পরিবার। সেভক রোড জুড়ে মোটর পার্টস। নিয়ন্ত্রণ মারোয়ারী-পাঞ্জাবী ও গুজরাটিদের হাতে। কোনও ব্যবসায় বাঙালির নিয়ন্ত্রণে নেই। পর্যটকরা এই শহরকে এক রাত্রি বাসের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। গড়ে উঠেছে হোটেল শিল্প। এখানেও মুষ্টিমেয় কিছু বাঙালি দেখা গেলেও এই ব্যবসাও নিয়ন্ত্রণ করে অবাঙালি ব্যবসায়ীরা। একই ছবি পরিবহণ ব্যবসার ক্ষেত্রেও।

এই শহর এখন ইট, বালু পাথরের কংক্রিটের শহর। শহরে ফাঁকা কোনও জায়গা নেই। অথচ এটাই কোনও শহরের ফুসফুস। নেই পার্কিংয়ের জায়গা। নেই জনসাধারণের জন্য শৌচালয়।

এই শহরের ভৌগোলিক সীমারেখা অদ্ভুত। কারও বাড়ির শোবার ঘর দার্জিলিং জেলায় আবার বসার ঘর জলপাইগুড়ি জেলায়, এমন উদাহরণও আছে। অনেক ওয়ার্ড শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে হলেও পুলিশ ও বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির অধীন। ফলে শিলিগুড়ির পুর এলাকায় বাস করলেও আইন আদালতের প্রশ্নে এখানকার বাসিন্দাদের ছুটতে হয় ৪৫ কিমি দূরে জলপাইগুড়ি শহরে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার রূপে গড়ে ওঠা শিলিগুড়ি শহরের গভীর বিপদ যে ধেয়ে আসছে তা কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারছে না।

ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক চুক্তি তথা বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে পরিবহণ ব্যবসা চালু হওয়ার যে চাপ আসছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে পরিবহণ চালু হয়ে যাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ভারত ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে শিলিগুড়ি হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার। আগে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং মেল পূর্ব বাংলার পার্বতীপুর হয়ে শিয়ালদহে যেত। এতে অর্থ ও সময় উভয়ই বাঁচত। উভয় দেশের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা খুলে গেলে দেশের বাণিজ্য সামগ্রী বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে সরাসরি পৌঁছে যাবে। তখন একমাত্র যুদ্ধ ইত্যাদির মতন আপৎকালীন অবস্থা ছাড়া শিলিগুড়ি যে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার রূপে যে বাণিজ্যিক সুবিধা এখনও পর্যন্ত ভোগ করে তা কতখানি বজায় থাকবে তা কিন্তু ভাববার প্রয়োজন আছে। একদা জলপাইগুড়ির দোমোহানি স্টেশন ছিল এই অঞ্চলের অন্যতম ব্যস্ত রেল স্টেশন। কারণ এই স্টেশনের ওপর দিয়েই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় রেল যেত। পূর্ব পাকিস্তান গঠনের পর সেই পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবার পর আজকের দোমোহানির অবস্থা হয়েছে স্মৃতিটুকু থাক-এর মতন এক প্রায় পরিত্যক্ত রেল স্টেশন। শিলিগুড়ি সে রকম পরিত্যক্ত শহরে রূপান্তরিত হবে না তো?

শিল্প পরিকাঠামোহীন এই শহর। ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল হয়ে আজ যে হাজার হাজার মানুষ শিলিগুড়িতে ছুটে আসছে তারা যে আগামী দিনে কাঠালগুড়ি চা-বাগানের অনাহারে মৃত শ্রমিকদের সহযাত্রী হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সেই নিশ্চয়তার খোঁজে শিলিগুড়িকে বাঁচাতে এখনই কার্যকরী ভাবনার দরকার। তার জন্য দরকার 'আমার শিলিগুড়ি' এই আবেগকে বুকে নিয়ে শিলিগুড়িকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা।

সৌমেন নাগ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

তরাইয়ে দেড়শ বছরের চা-শিল্পে আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত শিলিগুড়ি মহকুমা

দার্জিলিং পর্বতে ১৮৪০ সনে ক্যাম্বেল সাহেব চা-গাছ রোপন করলেন। এই চা-গাছ চিন থেকে আনা হয়েছিল। গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল। ১০মিটার উচ্চতা তার হয়েছিল কি না, জানা যায়নি। কারণ চা-গাছ না কাটলে ১০ মিটার অবধি বাড়ে। যাইহোক এরপরে সারা পর্বতে চায়ের জন্য জমি নেবার হিড়িক পড়ে গেল। ১৮৫৬ সনের মধ্যে পর্বতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা উৎপাদন শুরু হল। পর্বতে চা-বাগানের মালিক, কর্মচারী সবই ইউরোপীয়। তবে আদিম যানবাহনের যুগে কীভাবে ইউরোপীয়রা এতসব উদ্যোগ নিল, এত সব জানা যায় না। এখানে শ্রমিক সবাই নেপালি। দরিদ্র, ভূমিদাস লিম্বু, রাইসহ অন্যান্য নেপালিরা পূর্ব নেপাল ছেড়ে আস্তানা নিল দার্জিলিং অঞ্চলের চা-বাগানে। চা-কাজ শিখল কিছু চিনাদের হাতে, এর ছ'বছর বাদে শিলিগুড়ি সমতলে চা-চাষের উদ্যোগ নেওয়া হল।

পর্বতে ১৮৬০ সনের পর আর চা'য়ের জন্য জমি রইল না। সুতরাং এবার শিলিগুড়ি মহকুমা। ঊনবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে তরাইয়ের জঙ্গলাভূমি, বনভূমি, খাসজমি সব ত্রিশ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হল। প্রথমে অনেক চা-বাগান। পরে কিছু বাগানের সংযুক্তিকরণ হল। ফলে বাগান সংখ্যা কমল ঠিকই কিন্তু চা-চাষের একর কমল না। চা-মালিকরা খাস জমি, বন ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখেও দিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল থেকে ভারতীয়রা এল চা-শিল্পে। ফলে জোতজমি ও গো'চারণ ভূমি চা-চাষের জন্য কেনা হল। ভারতীয়রা জমির ক্ষেত্রে ইংরেজদের মত তেমন সুবিধে পেল না। শিলিগুড়ি মহকুমার চা-বাগানে এল ওঁরাও, মুন্ডা, খেরিয়া, খেরোয়াড, সাউরিয়া, মালপাহাড়িয়া, খাসী, তুরি, বরাইকের দল। এল সাঁওতাল পরগণার মানুষ। প্রথমে পায়ে হেঁটে। এরা হতদরিদ্র, প্রতারিত, ভূমিচ্যুত। তরাইয়ের বিখ্যাত রোগে মারা গেছে ওরা অনেকেই। উত্তর-তরাইতে কিছু নেপালিদের সঙ্গে থেকে ওরা চা-কাজ শিখল। বাগানে সব ছোটনাগপুরী শ্রমিক। পর্বতের মানুষরা ওদের 'মদেশীয়' নামে ডাকে। তরাইতে মধ্যপ্রদেশের 'রেওয়া' অঞ্চল থেকেও অনেক শ্রমিক এসেছিল। মধ্যদেশ থেকে ওরা এসেছিল বলে ওদের মদেশীয় বলা হত বলে অনেক মত পোষণ করেন। ১৮৮১ সালে রেল চলাচল শুরু হওয়ার পর ওদের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং একটানা ১৯৪৬ সন অবধি ওরা এখানে এসেছে। সে যাই হোক ১৮৭৩ সনের মধ্যে তরাইয়ের

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল থেকে ভারতীয়রা এল চা-শিল্পে। ফলে জোতজমি ও গো'চারণ ভূমি চা-চাষের জন্য কেনা হল। ভারতীয়রা জমির ক্ষেত্রে ইংরেজদের মত তেমন সুবিধে পেল না। শিলিগুড়ি মহকুমার চা-বাগানে এল ওঁরাও, মুন্ডা, খেরিয়া, খেরোয়াড, সাউরিয়া, মালপাহাড়িয়া, খাসী, তুরি, বরাইকের দল। এল সাঁওতাল পরগণার মানুষ। প্রথমে পায়ে হেঁটে। এরা হতদরিদ্র, প্রতারিত, ভূমিচ্যুত। তরাইয়ের বিখ্যাত রোগে মারা গেছে ওরা অনেকেই। উত্তর-তরাইতে কিছু নেপালিদের সঙ্গে থেকে ওরা চা-কাজ শিখল। বাগানে সব ছোটনাগপুরী শ্রমিক।

ভাল সব জমি চা-চাষের আওতায় চলে এল।

শিলিগুড়ি মহকুমার দক্ষিণাংশে ভারতীয় মালিকানার চা-বাগান তৈরি করেন জলপাইগুড়ির কিছু ধনী মানুষ। ব্রিটিশ আমলে নানা সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত হয়েও, এরা চা-শিল্প যেভাবে এ অঞ্চলে গড়ে তুলেছিলেন, তা এ যুগে বসে কল্পনা করা কঠিন। সমস্যা ছিল অনেক, তরাইয়ের নদী নালা ঝোরা পার হয়ে বাগানে পৌঁছানোও ছিল দস্তুরমত কষ্টদায়ক। রাস্তা সে অর্থে ছিল না বললেই চলে। যানবাহন বলতে গরুর গাড়ি, ভইসা গাড়ি ও ঘোড়া। তরাই তখনও ঘন বনে আবৃত। এই বনে ছিল হাজার প্রজাতির কীটপতঙ্গ ও হিংস্র পশু। কী ছিল না? ছিল ম্যালেরিয়া। লোকে বলে ম্যালেরিয়াতে নাকি এ অঞ্চলে কাকও মরত। তরাইয়ের চা-শ্রমিক ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, রিউমেটিক, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভারে মারা যেত বেশি। বিংশ শতাব্দীর তিন দশকে ইউরোপীয় ডাক্তারদের এক সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে এ অঞ্চলে 'ব্ল্যাক ওয়াটার' ফিভারের তাণ্ডব ছিল। তাঁরা একথাও বলেছেন, যে আদিবাসীদের হাঁড়িয়া এ রোগ হতে দিত না। অর্থাৎ হাঁড়িয়া ছিল এই রোগের প্রতিষেধক। যাই হোক এত প্রতিবন্ধকতা, এত বিপদেও ভারতীয়রা কীভাবে তরাই চা-শিল্প গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, তা ভাবলেও অবাক লাগে। তখন তো শিলিগুড়ি মহকুমায় অসম্ভব বর্ষা ও শীত। এসব উপেক্ষা করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। তবু চা-বাগান বাঙালিরা করেছে। যতদিন গেছে, তত বাঙালির বাগান বেড়েছে। শুধু তরাই নয়, ডুয়ার্সেও তারা বাগান

এখন যেখানে ঝাঁ চকচকে শপিং মল এখানেই ছিল চাঁদমণি চা-বাগান

বাড়িয়েছে। পর্বতে অবশ্য কোনও ভারতীয়দের চা-বাগান ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই রাজবংশী জোতদাররা তরাই ও ডুয়ার্স চা-বাগান প্রসারণে জমি দিয়েছে। এ জমি আবাদি জমি। চা-বাগান প্রসারণে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে রাজবংশী জোতদার ও চা-কর আঁতাত হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিন্তু বিত্তবান রাজবংশী সরাসরি চা-বাগানের প্রসারণে ও গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। তরাইয়ের এমন একটি চা-বাগানের নাম 'ভোজনারায়ণ চা-বাগান'। উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি তরাইয়ের বহু আবাদী ভূমি রাজবংশী জোতদাররা চা-বাগানের কাজে বিক্রি করায়, যেমন আবাদী ভূমি কমে আসে, তেমনই ভূমিপুত্ররাও জমি থেকে উৎখাত হতে থাকে। এই আলোচনা থেকে একটা জিনিসই প্রতীয়মান হয় যে, চা-বাগান প্রসারণে তখন শিলিগুড়ি মহকুমার ভূমিপুত্রদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল। সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ধীমালরা। ধীমাল জোতদার সহ ধীমাল সাধারণ মানুষ, এমন কী মেচরাও এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়।

জোতজমি চা-কররা নিয়েছিল অনেকগুলি সুবিধের কথা ভেবেই। প্রথমত জোতজমি নিলে চা-শ্রমিকদের 'মাইগ্রেশন হ্যাবিট' কমে আসবে। দ্বিতীয়ত, চা-শ্রমিকদের বাসস্থান নির্মাণে ওসব জমির বড় ঘাস, কাশ ও বাঁশ শ্রমিকদের বাসস্থান নির্মাণের কাজে লাগবে। তৃতীয়ত, যখন চা-কাজ থাকবে না, তখন শ্রমিকদের ওসব জমিতে ধানসহ অন্যান্য শাক-সবজির চাষে কাজে লাগানো যাবে। ফলে শ্রমিকদের খাদ্য নিয়ে ভাবতে হবে না। দরকারে ওদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসল বাবদ পয়সা নেওয়া যাবে। পরবর্তীকালে অবশ্য চা-করদের আরও সুবিধে হয়, কারণ যে সব শ্রমিকদের চাষ করার সুবিধে দেওয়া হয়েছিল, তাদের রেশন দেওয়া হত না। সবই শ্রমিক ঠকানোর বন্দোবস্ত আর কি! জোত জমিতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি যাতে রাখা যায়, তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। এসব চা-কররা নিজেদের স্বার্থের জন্যই করেছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে, চা-শ্রমিকদের শুধুমাত্র বাগানে আটকে রাখার জন্য এ ব্যবস্থা। কারণ তখন চা-শ্রমিক সুযোগ পেলেই বাগান থেকে পালিয়ে যেত এবং চা-করদের তাতে ভীষণ অসুবিধে হত। তরাই, ডুয়ার্সে তখন নানা কারণে শ্রমিক ধরে রাখা, বাঁচানো কঠিন এবং সুদূর ছোটনাগপুর থেকে শ্রমিক নিয়ে আসা ব্যয় সাপেক্ষ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক অবধি শিলিগুড়ি মহকুমায় ভীষণ শ্রমিক অভাব ছিল। ইংরেজ চা-বাগানগুলিও প্রচুর জোতজমি নিয়েছিল, মূলত এসব কারণেই। তখনকার ইংরেজ প্রশাসন ইংরেজ চা-করদের খাসজমির সঙ্গে জোতজমি নিতে সাহায্য করেছে। প্রথম পাঁচ বছর বিদেশি মালিকানাধীন বাগানের জমি বাবদ কোনও কর দিতে হয়নি। প্রশাসন, জোতজমি ২০ বছরের জন্য লিজ দিত। আর খাসজমি ত্রিশ বছরের জন্য। প্রশাসন ওদেরই। সুতরাং পরবর্তীকালে জোতজমি ও খাস জমি মিলিয়ে যে জটিলতা তা প্রশাসনই মিটিয়ে দিয়েছিল এবং করবাবদ খুব সামান্য পয়সা দিতে হত। এসব জমির একটা অংশ বনভূমি ছিল। চা-কররা এসব বনভূমি রেখে দিয়েছিল মূলত শ্রমিকদের জ্বালানির কাঠ পাওয়ার সুবিধের জন্য।

তবে জোতজমিতে জঙ্গল ছিল না, ফলে জ্বালানির সমস্যা ছিল। শ্রমিক শোষণ ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপে দেশি, বিদেশি বাগানের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। তখন শিলিগুড়ি মহকুমায় অজস্র জমি। সুতরাং জোত জমি নেওয়ার জটিলতা ছিল না। এ অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা ছিল সরল, উদার এবং প্রাকৃতিক কারণে অলস। চাহিদা ওদের কম ছিল। ধূর্ত ছিল না। ভূমিপুত্রদের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল। তাই এ অঞ্চলের ধীমাল, মেচ, থারু, রাজবংশী কেউই চা-কাজে যায়নি। বরং চা-কাজ ওরা ঘৃণা করেছে। পরাধীনতা ও অত্যাচার ওরা সহ্য করতে চায়নি। ওদের যে চা-কাজে পাওয়া যাবে না তা চা-কররাও আসামের অভিজ্ঞতায় বুঝে গিয়েছিল।

চা-শ্রমিকদের পারিশ্রমিক তখন চার আনা, মহিলা তিন আনা, শিশু কিশোর ছ' পয়সা। এ মজুরি দীর্ঘ ৫৫-৬০ বছরেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। তারপর বিনা কারণে পারিশ্রমিক না দেওয়া, বেত্রাঘাত করা, চাবুক মারা সবই ছিল। বন্দি ছিল ওরা। হাটে, গুদরি হাটেও শ্রমিকদের ওপর কড়া নজর। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এলে হাজারো জেরা ও অপমান। সুন্দরী হলে ম্যানেজারদের দৈহিক লালসার শিকার। প্রচণ্ড ঠান্ডায়, গরমে, বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নিচে চা-পাতা তোলা। চা-শ্রমিক একটু কথার অবাধ্য হলেই, পরিবারের সবাইকে রাতের অন্ধকারে গভীর বনে ছেড়ে দেওয়া হত। তারপর কী হত সহজেই অনুমেয়। এ ব্যবস্থাকে বলা হত 'হপ্তাবাহার' আর পর্বতে 'হটাবাহার'। শ্রমিকদের নৈতিক সাহস ছিল না, তবুও ওরা হাসত। সারারাত নাচগান করত। প্রয়োজনে শিকারে যেত। আজ আর সে অবস্থা নেই। গণবেশ্যাবৃত্তির জন্য ওদের সে আমলে বিক্রি করা হয়নি। আজ হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহকুমায় তখন ভারতীয় মালিকানায় বাগানের সংখ্যা ভালই ছিল। যেমন চাঁদমনি (আজকের 'উত্তরায়ণ' কমপ্লেক্স এলিটদের বসবাস ও ফুর্তির জায়গা), সতীশচন্দ্র, বিজয়নগর, ভোজনারায়ণ, কিরণচন্দ্র, কমলা, কমলপুর, মতিধর, নিশ্চিন্তপুর, সাহাবাদ, সৈয়দাবাদ ইত্যাদি। বাঙালি মালিকানার অপদার্থতায় একের পর এক এসব বাগান অন্যের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। অন্যদের বলতে অবাঙালি ব্যবসায়ী যারা 'কুইক প্রফিট'-এ বিশ্বাসী, যারা ৭৫-৮০ বছরের চা-বৃক্ষ উৎপাটন করে না, যারা 'প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট'-কে বুড়ো আঙুল দেখায়, যারা শ্রমিকের পিএফ চুরি করে, যারা কথায় কথায় চা-বাগান বন্ধ করে দেয়। লাভের টাকা ইংরেজরা না হয় নিজ দেশে পাঠাত। এরা কোথায় রাখে, কোথায় পাঠায়? কে খোঁজ নেয়?

চা-শিল্পে নানা কারণে সঙ্কটেই আন্তর্জাতিক চা-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ল ভারত। অন্তত কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা তাদের টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। কেন? শ্রমিকদের দোষে? উত্তরবঙ্গে বর্ষা, শীত কে কেড়ে নিল? বন, গাছপালা কেটে ফেললে এসব হবেই। যে অবস্থা চলছে, তাতে চা-শিল্পের আরও অবনতি অনিবার্য। এককালে রাশিয়া চায়ের বদলে বিদেশি মুদ্রা দিত। এখন কে দেবে? চায়ের 'কোয়ালিটি'-র দিকে ইংরেজদের নজর ছিল। আজ কোয়ালিটি ছেড়ে জোর দেওয়া হচ্ছে 'কোয়ানটিটি'-র দিকে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ দিয়ে, ভূগর্ভস্থ আয়রন মিশ্রিত জল দিয়ে চা-গাছগুলোকে শেষ করা হচ্ছে। বিদেশের পরিত্যক্ত কীটনাশক ব্যবহার কি চা-শিল্পের ভালর জন্য? খাবলা করে পাতা তুলে, শ্রমিক মেরে, চা-শিল্পের কি উন্নতি হবে? চা-গাছকে তীব্র রোদের হাত থেকে বাঁচাতে ছায়া তরু দরকার। আজ ছায়াতরু বলতে ইউক্যালিপটাস্, ঘোড়া নিম, সেগুন, আকাশমণি। আর নিচে 'পার্থেনিয়াম'। ইউক্যালিপটাস জমি থেকে সমস্ত জল নিংড়ে নিয়ে জমিকে শুষ্ক করে চা-গাছের ক্ষতি করে। সেগুন তো আরও ক্ষতিকারক। ঘোড়া নিম, আকাশমণি এসব চা-বাগানের স্বর্ণযুগে ছিল না। এ অঞ্চলে সারা বছর রোদের তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। সুতরাং পর্বতের চা-বাগানকেও স্যাঁতসেতে রাখা যাচ্ছে না। তীব্র রোদ চা-গাছের ক্ষতি করে। পর্বতে অন্তত কার্শিয়াং অবধি চা-বাগানে ছায়া তরুর দরকার হত না। উষ্ণায়নের জেরে আজ না হোক কাল পর্বতেও ছায়া তরু লাগাতে হবে। অতীতে বৃষ্টি প্রচুর হত। উনবিংশ শতাব্দীতে তো বটেই, তার পরেও। তরাইতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০৬ থেকে ১৭৫ ইঞ্চি ছিল, অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরর পর। ১৯৮০ সনে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কমে দাঁড়াল ৩০০ সেন্টিমিটার। ইংরেজ আমলে উঁচু নিচু ঢাল জমিতে চা-বাগান গড়ে ওঠে। আজ ওসবের বালাই নেই।

আর কীটনাশক শুধু দিলেই হবে? এ অঞ্চলে কী

ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত, কতটা ব্যবহার করা হবে, শ্রমিকরা কীটনাশক স্প্রে করতে, আত্মরক্ষার্থে কী ধরনের 'প্রটেকশন' নেবে, রাসায়নিক সার কত পরিমাণে জমিতে দেওয়া হবে, জৈবিক সার-এর ব্যবহার ও পরিমাণ কতটা বাড়ালে চায়ের গুণগত মান বাড়বে— এসব নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষা ও আন্তরিকতা না থাকলে চা-শিল্প একদিন অবলুপ্তির পথে চলে যাবে বলাই বাহুল্য।

শিলিগুড়ি মহকুমায় ১৯৮১ সন অবধি ৪৬টি চা-বাগান ছিল। উৎপাদিত চায়ের কোয়ালিটি ডুয়ার্সের মতই। পর্বতের চায়ের মত সুন্দর 'ফ্লেভার' নেই। চা-শ্রমিকের ৭ শতাংশ নেপালি শ্রমিক। তরাই চা-শ্রমিক 'হেটারোজেনিয়াস' অর্থাৎ বিচিত্র প্রজাতির মিশ্রণ, আর পর্বতের শ্রমিক 'হোমোজেনিটি নেচার'-এর অর্থাৎ সমগোত্রের। একমাত্র দার্জিলিং জেলা ছাড়া পর্বতের অন্য কোথাও শ্রমিকদের বৈচিত্রপূর্ণ এই বৈশিষ্ট্য নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে নদীয়ার এক বাঙালি ও বর্ধমানের ধনী এক ব্যক্তি চা-বাগান কিনেছিলেন। বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, ১৮৬৫ সালে গঠিত 'মোহর গাঁ চা-বাগান' ইংরেজ এক ব্যক্তির থেকে কিনে নেন। পাল চৌধুরীদের বাগান আর হাতবদল হয়নি। বিপ্রদাস উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। 'সন্ন্যাসী থান' চা-বাগানও ছিল হিন্দু বাঙালির। এছাড়া অন্যান্য চা-বাগানের কিছু, পরাধীন ভারতে হাত বদল হয়। তবে ব্যাপক হাত বদল ঘটে স্বাধীনতার পর এবং অধিকাংশ বাগানের আদি নাম মুছে যায়। 'দাগাপুর' আগে 'পঞ্চানই' চা-বাগান নামে খ্যাত ছিল। বড় চেঙ্গা, ছোট চেঙ্গা নামেও চা-বাগান ছিল। পরে তা বড় বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর অবাঙালি ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলের চা-বাগান কিনে নেয়। এরা ৭৫-৮০ বছরে চা-গাছ উৎপাটন করে না। যাই হোক জলপাইগুড়ির তারিণী রায় ও বি সি ঘোষের পিতা এবং কিষাণগঞ্জের এক মুসলিম ধনী ব্যক্তি তরাইতে বেশ কয়েকটি চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। নদীয়ার সাহা-রা প্রতিষ্ঠিত করেন সাহাবাদ চা-বাগান। এ বাগান ১৯৫৬ সনের আগে পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' এসব জমি তখন কীভাবে চায়ের জন্য দেওয়া হয়, তা জানা যায় না। ১৯৫৬ সনে উপরিক্ত বাগান ও 'মতিধর'— ইত্যাদি বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমায় যুক্ত হয়। চাঁদমণি চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেন প্রয়াত তারিণী প্রসাদ রায়। এছাড়া জলপাইগুড়ির মোশারেফ হোসেনও তরাইতে একাধিক চা-বাগানের গোড়াপত্তন করেন। বিভিন্ন কারণে তরাইতে চা-বাগানের হাত বদল হয়। কখনও তীব্র শ্রমিক অভাব, কখনও কীটপতঙ্গের অত্যাচারে একটানা আর্থিক ক্ষতি।

চা-শিল্পের প্রসারের পরিণতি হয়েছে মারাত্মক। পরিবেশের ভারসাম্য যেমন বিনষ্ট হয়েছে, পর্বতে ধ্বস পড়ার হিড়িক এতে বেড়েছে, নদী গর্ভ ক্রমশ ভরাট হচ্ছে, পর্বতে ও সমতলে উপরিভাগের মাটি ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। চা-শিল্পের প্রভাবে যে অরণ্য নিধন হল, তা ডেকে আনল উপজাতি জীবনে বিপর্যয়। বহু মূল্যবান গাছ যা রোগ-নিরাময়ে কাজে লাগে শেষ হয়ে গেল। সুসভ্য মানুষের লোভে, লাভে, সুবিধায় এতদিনের লালিত উপজাতিদের সুস্থ, স্বাধীন সংস্কৃতি শেষ হল। ইংরেজ চা-কররা বাঙালি-নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করল। নেপালি-লেপচা সম্পর্কের অবনতি, নেপালি-ভুটিয়া সম্পর্কের সঙ্কট (১৯২০) ইংরেজ চা-কররাই করেছিল। ইংরেজ আমলের আরও এক অভিশাপ গোর্খাল্যান্ডের দাবি। অর্থাৎ 'ডিভাইড অ্যান্ড

'প্ল্যানটার রাজ'-এর আমলে জীববৈচিত্র্যময় হিমালয় ও তরাইতে ক্ষতির পরিমাপ করা সত্যিই কঠিন। চা-শিল্প স্থাপনের পর ওই শিল্পকে কেন্দ্র করে কোনও সহায়ক শিল্প স্থাপনে ওরা বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। ওদের অর্থনীতি সামান্য বাঙালি, বিহারী, মারোয়াড়িদের ধনী করলেও এ অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের নিঃস্ব করে ছেড়েছে। সমতলের বহু সৌন্দর্যময় স্থান চা-করদের দাপটে নষ্ট হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে, আজ এ অঞ্চলের যে প্রাকৃতিক সমস্যা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ দুষ্প্রাপ্য, মৎস্য যে অবলুপ্ত হয়েছে এবং অন্যান্য বহুবিধ যে জটিল সমস্যা, সেই সঙ্কটের বীজ ওরাই রোপন করে গেছে। এ অঞ্চলের মানুষ শিক্ষিত, সচেতন হয়ে উঠুক চা-কররা তা কখনই চায়নি। চা-কররাই ছিল এ অঞ্চলের শাসক ও শোষক।

রুল পলিসি' এখানেও ওরা বলবৎ রেখেছিল। ইংরেজ চা-কররা বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমা সহ সমগ্র চা-শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল। চা-করদের দাপটে সমগ্র দার্জিলিং জেলা ও এই মহকুমায় যাতে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা না বাঁধে, সে ব্যাপারে চা-কররা ছিল সদা সচেষ্ট। কীভাবে এ অঞ্চলের মানুষদের হতোদ্যম করা যায়, তা ওরা ভালই জানত।

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং পর্বতের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ও এ অঞ্চলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণে সবচেয়ে বেশি অবদান চা-শিল্পের। পর্বতে নেপালি সম্প্রদায়ের অস্বাভাবিক পরিমাণ অনুপ্রবেশের ফলে ওই অঞ্চলের লেপচা, ভুটিয়ারা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। তিব্বতী প্রভাব রুখতে গিয়ে এ অঞ্চলের বহু সমস্যা, সঙ্কটের বীজ রোপন করে গেছে ওরাই।

'প্ল্যানটার রাজ'-এর আমলে জীববৈচিত্র্যময় হিমালয় ও তরাইতে ক্ষতির পরিমাপ করা সত্যিই কঠিন। চা-শিল্প স্থাপনের পর ওই শিল্পকে কেন্দ্র করে কোনও সহায়ক শিল্প স্থাপনে ওরা বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। ওদের অর্থনীতি সামান্য বাঙালি, বিহারী, মারোয়াড়িদের ধনী করলেও এ অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের নিঃস্ব করে ছেড়েছে। সমতলের বহু সৌন্দর্যময় স্থান চা-করদের দাপটে নষ্ট হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে, আজ এ অঞ্চলের যে প্রাকৃতিক সমস্যা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ দুষ্প্রাপ্য, মৎস্য যে অবলুপ্ত হয়েছে এবং অন্যান্য বহুবিধ যে জটিল সমস্যা, সেই সঙ্কটের বীজ ওরাই রোপন করে গেছে। এ অঞ্চলের মানুষ শিক্ষিত, সচেতন হয়ে উঠুক চা-কররা তা কখনই চায়নি। চা-কররাই ছিল এ অঞ্চলের শাসক ও শোষক। ওদের প্রবর্তিত জমি ব্যবস্থায় এ অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে যায়। আইন তৈরি থেকে আরম্ভ করে বিচারকার্য সবই করত।

স্বাধীনতার পরেও সরকার এ অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়নি। চা-শিল্প আজ যে ব্যবসায়ীদের হাতে তারা ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্ক লোন নেয় কোটি কোটি টাকা। অথচ টাকা শোধ না করে দিব্যি ভাল থাকে। মালিকপক্ষ ওদের কয়েক কোটি গ্র্যাচুইটির টাকা মেরে দেয়, এমন কী এলআইসি-তে শ্রমিকদের মজুরির থেকে কেটে নেওয়া অংশও জমা করে না। 'টি-বোর্ড' আছে নামেই। এরা অসাধু চা-মালিকদের শায়েস্তা করতে পারে না। নতুন চা-চারা রোপন করতে বাধ্য করতে পারে না। যখন তখন চা-বাগান বন্ধ। গত শতাব্দীর চারের দশকে ও পাঁচের দশকে যে ট্রেড ইউনিয়ন ছিল, আজ তা নেই। এখনকার শ্রমিক নেতারা শ্রমিক দরদী নয় বরং মালিক দরদী। অভাবের তাড়নায় রাজবংশী মহিলারাও অস্থায়ী ভিত্তিতে পাতা তোলার মরশুমে চা-কাজ নিচ্ছে। এদের পারিশ্রমিকও খুব কম। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এরা তিনভাগের এক ভাগ বেতন পায়। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরাও এদের চেয়ে বেশি মজুরি পায়। চা-শ্রমিকদের এই দুর্দশা আজ নতুন করে আলোড়ন তুলতে পারে না। চা-বাগানে পানীয় জলও শ্রমিকরা পায় না, তাই দূষিত ডলোমাইট মিশ্রিত জল ওরা পান করে। স্বাধীনতার ৭১ বছর পর চা-শিল্প শ্রমিকের ক্ষতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চা-ব্যবসা ভারতে আজও লাভজনক। কিন্তু লাভের টাকা মালিকরাই ভক্ষণ করে। শ্রমিক স্বার্থে বা চা-গাছের উন্নতিতে সে টাকা ব্যয় করা হয় না। কেউ দেখার নেই। অথচ শ্রীলঙ্কায় চা-শিল্পকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানকার সরকার। শ্রমিকরা ওখানে মাসে সাত-আট হাজার টাকা বেতন পায়। উৎপাদনও ঊর্দ্ধমুখী। বিদেশে আজকাল ভারতের চা বিক্রি ক্রমাগত নিম্নমুখী। একমাত্র আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যই আজ চা-শিল্প বেঁচে আছে বলা যায়।

দেড়শ বছর আগে ইংরেজ চা-করদের দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদে হিমালয় থেকে নেমে এসে এই পাদদেশেও সূচনা হয়েছিল চা-শিল্পের। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভিনরাজ্যের শ্রমিক অভিবাসনের জোয়ারে আর্থসামাজিক চেহারা ও সংস্কৃতির বিশাল পরিবর্তন ঘটে যেতে থাকে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায়। গোটা উত্তর পূর্ব ভারতের মতই এখানেও ভবিষ্যতের পরিণামের দিকে স্বভাবগত কারণেই তাকায় নি শ্বেত বণিকদল, ফলত ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ে জঙ্গল ও জীববৈচিত্র্য তথা প্রকৃতির ভারসাম্য। অথচ শ্রমিকের আয় বাড়ল না, তাদের দুর্দশার জীবনযাত্রা অপরিবর্তিত থাকায় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে নি। স্বাধীন ভারতে ইংরেজ বণিকদের জায়গা নিল অসাধু দিশী বেওসায়ীরা যাদের দাক্ষিণ্যে 'কোয়ালিটি' শব্দটি তরাইয়ের চা থেকে ক্রমশ অন্তর্হিত হতে থাকল। আর শ্রমিক শোষণ জারি থাকল 'জনকল্যাণপন্থী' সরকারকে সাক্ষী রেখে। চা-শিল্পের তীব্র সংকট তাদের টনক নড়াতে পারে নি, কিংবা তাদের বণিকের দাসত্বকেই প্রমাণ করে গিয়েছে। আজ ক্ষুদ্র চা-চাষের বিস্তারের মাধ্যমে চায়ের ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা খোঁজা হলেও তা সাধারণ শ্রমিকের জীবনের মানোন্নয়নে কিছুই করতে পারে নি। উদ্বাস্তু জন বিস্ফোরণ এবং কৃষি ও শিল্পহীনতা কোনও বিকল্প পথ বাতলাতে পারে নি। ফলে আজও ডুয়ার্সের পাশাপাশি দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের অন্ধকারে নিমজ্জত হয়ে আছে তরাই শিলিগুড়ি মহকুমা, উদার দানধ্যানের নীতি যার কোনও সমাধান আনতে পারে না।

অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কঠিন বর্জ্যহীন শহরের নিজস্ব ভাবনা নিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় শিলিগুড়ি

ইংরাজিতে যাকে বলে 'রিনিউয়েবলস' বা 'গ্রিন এনার্জি' অর্থাৎ প্রকৃতিতে যে স্থানীয় লভ্য ক্ষয়হীন শক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোড়ন চলছে পৃথিবী জুড়ে সেই রিনিউয়েবলস নিয়ে আন্তজাতিক একটি সম্মেলনে যোগ দিতে সম্প্রতি ইওরোপ গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র **অশোক ভট্টাচার্য**। জার্মানির ফ্রেইবার্গ শহরে আয়োজিত আলোচনা সভায় অশোকবাবুর বক্তব্যের বিষয় ছিল A pathway towards low carbon & Circular Economy —বাংলায় যার মানে করলে দাঁড়ায় 'লো কার্বন ও বৃত্ত অর্থনীতির পথ'। এখানে তাঁর বক্তব্যের নির্যাসটুকু তুলে ধরবার চেষ্টা করা হল। —সম্পাদক

শিলিগুড়ি শহরের প্রতিনিধি হিসেবে এই বিষয়ে বলবার আগে আমি শহর শিলিগুড়ির পটভূমিকা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতে চাই। শিলিগুড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত একটি দ্রুত উন্নয়নশীল নগরী। অবস্থানগত কারণে আর আর্থিক কারণে শিলিগুড়ি ভারতের পূর্বাঞ্চল আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি দ্রুত বেড়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগর। অবস্থানগত ভাবে শিলিগুড়ি তিনটে দেশের সীমানা সংলগ্ন— বাংলাদেশ, নেপাল আর ভুটান। চিন সীমান্তও শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ১৫০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। অবস্থানগত কারণে এই এলাকাকে ভারতের 'চিকেনস নেক' বা মুরগির গলা-র আকারের বলা হয়।

শিলিগুড়ি শহরে ৪২ বর্গ কিমির মধ্যে সাত লক্ষ লোক বাস করেন। বিরাট এলাকার অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হওয়ার কারণে এই শহরে আশপাশের এলাকা, ভিনরাজ্য, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, ভুটান আর বাংলাদেশ থেকেও পরিযায়ী শ্রমিকরা এই শহরে কাজের খোঁজে আসেন। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সামাজিক আর রাজনৈতিক অস্থিরতাও শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি মুখ্য কারণ। এই সমস্ত কারণে বিগত দুই দশকে শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে শহরের নাগরিক পরিষেবার ওপর অস্বাভাবিক চাপ বাড়ছে।

শহর আর শহরতলীর জনস্ফীতি নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। যেমন নদী দূষণ বাড়ছে, বাড়ছে কার্বন নিঃসরণ, বায়ুদূষণ, জলাভাব, কমছে শহরের যানবাহনের গতি, বাড়ছে কঠিন বর্জ্যের সমস্যা। শহর শিলিগুড়ি এমনিতেই অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, বিশেষত বর্ষার সময়।

CapaCITIES নামে পরিচিত এই প্রকল্পে যে শিলিগুড়ি শহরের কঠিন বর্জ্য সমস্যা, জল সরবরাহ, পরিবহণ এবং বাতাসের গুণগত মান, পরিযায়ী শ্রমিকদের বস্তির উন্নয়নকে তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে, সেজন্য আমি আয়োজক সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচী বৃত্ত অর্থনীতির প্রসারে অত্যন্ত কার্যকরী হবে। কারণ এ এমন একটা সময় যখন প্রকৃতির সম্পদ বৃদ্ধির গতির চাইতে বহুগুণ গতিতে চলছে মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, যখন অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা, তখন প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়ী বা টেঁকসই (Sustainable) ব্যবহারের উপায় বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে বৃত্ত অর্থনীতি (Circular Economy) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা দাবি করে। ভূমি, জ্বালানি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের প্রতি সুষম দৃষ্টিভঙ্গী দাবি করে বেড়ে চলা নাগরিক জনসংখ্যা। আর এই বিষয়টি শুধুমাত্র উন্নত দেশের সমস্যা নয়, ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশেরও অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে ভারতের, কেননা ভারত তার দ্রুত বেড়ে চলা তরুণতর জনগোষ্ঠী আর ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজের কারণে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ Consuming countries বা ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারী দেশ-এ পরিণত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। নগরায়ণের এই প্রক্রিয়া বিশ্বের মৌলিক পরিবর্তনের এক প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা উদ্বেগজনক। বিশেষত নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতির যুগে ভারতে এই নগরায়ণের প্রক্রিয়া জটিল এবং অসমঞ্জস চরিত্রের, একটির সঙ্গে আরেকটির সাযুজ্য মেলে কম।

সত্যি কথা বলতে, বৃত্ত অর্থনীতির ধারণা ভারতে একেবারেই নতুন নয়। প্রাচীন ভারত জীবনের সুর

ফ্রেইবার্গের মেয়রের সঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র। সঙ্গী যোগদানকারী হিসেবে গিয়েছিলেন মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্য মুকুল সেনগুপ্ত।

বেঁধেছিল প্রকৃতির সুরের সাথে সুর মিলিয়েই। প্রকৃতিকে দেবী রূপে পুজো করা বা প্রকৃতিকে মায়ের আসনে বসানো, সেই সংরক্ষণশীল নৈতিকতাকেই আশ্রয় করে, যার ধারা প্রবাহিত হয় তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সব ধারণায়। এখানে সহজ সরল জীবনধারণের কৌশল ব্যবহৃত হত, যেমন জৈব বর্জ্য থেকে সার তৈরি, যাকে আজ আমরা কম্পোস্ট বলি। খাদ্য বর্জ্য মাটিতেই ফিরিয়ে দেওয়া প্রাচীন সময় থেকেই ভারতে প্রচলিত, যা অস্থায়ী পুনর্ব্যবহার যোগ্য নিউট্রিয়েন্ট আর মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ব্যবহারের একটি অসাধারণ উদাহরণ। এই যুগে বিজ্ঞানীরা এই প্রকৌশলের নাম দিয়েছেন Phyto remediation।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি CapaCITIES প্রকল্পটির ভাবনা এই বৃত্ত অর্থনীতিকে সমর্থন করে। এর স্বপক্ষে আমি একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। CapaCITIES আমাদের শহর শিলিগুড়িতে একটি পাইলট প্রজেক্ট শুরু করেছে দুটি ওয়ার্ডে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘শূন্য’। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যার মানে ইংরাজিতে ‘জিরো’। এই নামকরণে রয়েছে আমাদের প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত— কঠিন বর্জ্য প্রায় শূন্যে নিয়ে যাওয়ার। সরলরৈখিক অর্থনীতির সরল সূত্র— ভোগ কর-ব্যবহার কর-উদ্বৃত্ত ফেলে দাও, আর সেই উদ্বৃত্ত বর্জ্য ভ্যাট, জমিতে স্তূপীকৃত কর। বৃত্ত অর্থনীতি মানেই ‘রিসাইকেল’ (পুনর্ব্যবহার, যেমন বোতলের আবার সরাসরি ব্যবহার) আর ‘আপসাইকেল’ (বস্তুকে পুনর্ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার) দুই-ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘শূন্য’ প্রকল্পে প্রথমে বাড়ি বাড়ি দুটি ভিন্ন পাত্রে জৈব আর অজৈব (ভেজা আর শুকনো) বর্জ্য সংরক্ষিত হয়। ৭৫০০ বাড়ি থেকে তা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে গাড়িতে করে সংগৃহীত হয়ে জৈব আর অজৈব দুটি ভ্যাটে আলাদা করে জমা হয়। জৈব বর্জ্য কম্পোজড সারের জন্য আলাদা জায়গায় যায় আর অজৈব বর্জ্য আবার প্লাস্টিক, কাগজ, কাচ ও অন্যান্য উপাদানে আলাদা আলাদা ভাগ করা হয়। সেই বর্জ্য কোনওটি রিসাইকেলে পাঠানো হয় আর কোনওটি আপসাইকেলের জন্য চলে যায়। এই পুরো প্রকল্পটি এখন চালু আছে এবং এটা সরলরৈখিক অর্থনীতি থেকে বৃত্ত অর্থনীতিতে রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই সুযোগে আমি প্লাস্টিক ব্যবহারের বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বৃত্ত অর্থনীতির ভাবনার ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে প্লাস্টিকের ব্যবহার, বড় অন্তরায় এটিই। শিলিগুড়ি শহরে প্লাস্টিকের ব্যবহার ন্যূনতম করার জন্য আমরা শহর শিলিগুড়িতে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছি। এর অন্যথায় কঠিন শাস্তির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এক বিরাট মিছিল গোটা শহর পরিক্রমা করে, যাতে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন এনজিও, নানা অলাভজনক সংস্থা এবং অসংখ্য সাধারণ নাগরিক।

বৃত্ত অর্থনীতির ধারণা এই আধুনিক যুগে সফল হতে পারে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণে এবং বিকেন্দ্রীকরণে। ভারতবর্ষ এবং তার শহর, নগরগুলি বিশেষভাবে চালিত হয় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসন দ্বারা এবং পার্লামেন্ট ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। শিলিগুড়ি নগর নিগমকে ভাগ করা হয়েছে পাঁচটি বরো আর ৪৭টি ওয়ার্ডে। জনগণের উন্নয়নের চাহিদা, আর্থসামাজিক চাহিদা সব নগর নিগমের কাছে পৌঁছায়, ৪৭টি ওয়ার্ডের ৪৭ ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে। প্রতিটি

জঞ্জাল রিসাইকেল করে ব্যবহার করা যেতে পারে

বৃত্ত অর্থনীতির ধারণা ভারতে একেবারেই নতুন নয়। প্রাচীন ভারত জীবনের সুর বেঁধেছিল প্রকৃতির সুরের সাথে সুর মিলিয়েই। প্রকৃতিকে দেবী রূপে পুজো করা বা প্রকৃতিকে মায়ের আসনে বসানো, সেই সংরক্ষণশীল নৈতিকতাকেই আশ্রয় করে, যার ধারা প্রবাহিত হয় তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সব ধারণায়। এখানে সহজ সরল জীবনধারণের কৌশল ব্যবহৃত হত, যেমন জৈব বর্জ্য থেকে সার তৈরি, যাকে আজ আমরা কম্পোস্ট বলি।

ওয়ার্ড কমিটির রয়েছে একটি করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি। পাঁচটি বরো কমিটির নজরে ৪৭টি ওয়ার্ড কমিটি এবং ৪৭টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন কমিটি বর্জ্য সংগ্রহরে দিকে নিয়মিত নজর রাখেন।

নিয়মিত এই ব্যবস্থার চর্চা ‘শূন্য’ প্রকল্প রূপায়নে খুবই সহায়ক হয়েছে। জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওয়ার্ড কমিটিগুলোর মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ বা পরামর্শ দুই-ই আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁরা এই প্রকল্প হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন যা আমাদের এই প্রকল্প রূপায়ণে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

বৃত্ত অর্থনীতিকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা, শিলিগুড়ি পুর নিগম, SDC -র সাহায্যে একটি Climate Resilient City Action Plan for Siliguri তৈরি করেছি। এটা CapaCITIES প্রকল্পেরই অংশ। সদ্য সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে আমাদের কাউন্সিলরদের বোর্ড মিটিং-এ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করতে চাই যে, আমাদের শিলিগুড়িই ভারতের প্রথম নগর নিগম যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলি কমিয়ে আনা আর যে পরিবর্তন স্থায়ী তার সাথে অভিযোজন, এইভাবে সমস্যার সমাধান বের করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বৃত্ত অর্থনীতিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি (১) সরলরৈখিক অর্থনীতি (২) বৃত্তীয় অর্থনীতি এবং (৩) পুনর্ব্যবহার। এখানে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। উন্নত আর উন্নয়নশীল এই দুই বিশ্বের শহরগুলির প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার এবং স্কিল বা কর্মশৈলির মধ্যে দুস্তর পার্থক্য, এটা ভুললে চলবে না। অতএব আমাদের সমস্ত সমস্যার বা খামতির সমাধান কেবলমাত্র বহুমূল্যের প্রযুক্তি দিয়েই সম্ভব নয়। গণতন্ত্র, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের ব্যাপক সচেতনতা আর অংশগ্রহণের কোনও বিকল্প নেই। প্রাথমিক উন্নয়নের কাজগুলিকে শেষ করা এবং দারিদ্র দূরীকরণ উন্নয়নশীল দেশের বড় সমস্যা। সেইজন্য জ্বালানি বা শক্তির স্থায়ী পুনর্ব্যবহার এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে পরিশেষে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের কথা। আমরা তার থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক উন্নত বিশ্বে তৈরিতে ব্রতী হব। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, এই বিশ্বে আমাদের প্রয়োজনের সব আছে কিন্তু তা লোভ মেটানোর জন্য নয়। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে সম্পদ, নিজেদের লোভ মেটাতে তার সাথে কোনও অন্যায় সমঝোতা নয়, আজকের চাহিদা মেটানো সম্ভব স্থায়ী (Sustainable) উন্নয়নের মাধ্যমে। আগামী রিও বসুন্ধরা সম্মেলনের এই বার্তাই হোক উন্নয়নের দীপবর্তিকা।

(মূল ইংরেজি রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন তাপস বরণ চন্দ)

বিশেষ নিবন্ধ

উত্তরের জ্ঞান পীঠ

এয়ারভিউ মোড়ে বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে এধারে এসে হিলকার্ট রোডের মুখে জীর্ণ নাকবোচা চেহারার বাসগুলোর গায়ে ঝুলে ঝুলে 'শিবমন্দির শিবমন্দির' করে যারা চেঁচাচ্ছে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ঝোলাঝুলি সমেত উঠে জানালার ধারে বসে পড়া গেল। প্রথমবার বাড়ি ছেড়ে যেতে খুব একরকম বুকভাঙ্গা কষ্ট হয়েছিল! সেবার ছিল ময়নাগুড়ির স্কুল হোস্টেল। সেই গ্রাম, বাড়ি, উঠোন, ফসলের মাঠ, বাড়ির পাড়ার যত কুকুর বেড়াল আর সব পোষ্য, গাছপালা, পাখপাখালি, অবাধ আকাশ, বন্ধুর দল, খেলার মাঠ, আত্মীয় স্বজন সবার জন্যেই নোনতা জল গড়িয়েছে চোখে। তারপর তিস্তাপাড়ে কলেজ হোস্টেল। ধীরে ধীরে হোস্টেল জীবনের মজা রপ্ত হয়ে গেছে ততদিনে। এবারে আর একটু দূর আর মনে খানিক ভয়, শংকা! ওখানে সেমিস্টারের ঘন ঘন পরীক্ষা, তায় নম্বর-টম্বর সংক্রান্ত আরও নানা প্রাসঙ্গিক টুকিটাকি কথায় একটু চিন্তার মেঘ! তবে সেসব ছাড়িয়ে রোমাঞ্চই বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় বলে কথা। চাকরি হবে, নিজের উপার্জন হবে এমন সব স্বপ্নের কুচি মনের ঝোলায় ভরেই বাসে উঠা বসা।

তারপর মহানন্দা আর বালাসন পেরিয়ে, চা-বাগান, অদূরের পাহাড় -জঙ্গল চমৎকার সব ছবির মত দৃশ্য দেখতে দেখতে স্বল্প পথটুকু পেরিয়ে টুক করে নেমে পড়া গেল শিবমন্দির স্টপে। রাস্তার ধারেই দরমার বেড়ার, বাঁশের ঝাপের, নড়বড়ে বেঞ্চ পাতা গুটিকয় দোকান। চা, রুটি-সব্জি, ভাত-মাছ সব পাওয়া যায়। খেয়ে নিয়ে দোকানগুলোর পেছন দিয়েই দিব্যি পথ, গেট গ্রিল কিচ্ছু নেই সটান হোস্টেলের দরজায়। মেয়ে হোস্টেলে অবশ্য কোলাপ্সিবেল গেট ছিল যথারীতি। বেশ খোলামেলা সবুজে সবুজ। দূরের পাহাড়, শালবন, টিয়ার ঝাঁক, কাশের দোলা অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়ানো ছেটানো বিশাল ক্যাম্পাস। তারুণ্যের জোয়ার, ক্যান্টিনে টেবিল বাজিয়ে গান বাজনা। এমন প্রাণের আনন্দ খুশির জোয়ারে ভাসা দিনরাত,আহা ! জীবনের খুব মূল্যবান সময় ওই দুটি বছর। যারা সঠিক কাজে লাগাতে পারল তো আগামী দিনের জন্যে খানিক নিশ্চিন্তির আশ্বাস। তবে ওই উচ্ছল বয়সে আগত দিনের জন্যে সবাই সুস্বপনই দেখে; বেকারত্বের হাহাকার ক্রোধ আর হতাশায় ভরা দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও যৌবনের সদর্থক চেতনা আর আত্মবিশ্বাস আমাদের সুখের স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত করতে পারেনি। আর বাংলা নিয়ে পড়া,তাতে চিড়িয়াখানার সিংহের খাঁচায় বাংলায় এম এ'দের শেষ গতির জোকস লোকে ঠারেঠোরে শোনাতে ছাড়ত না মোটে। ভবিষ্যৎ নিয়ে অতশত ভাবনাচিন্তায় ব্যস্ত হতে তখন বয়েই গেছে; আসল কথা স্বাধীনতা মানে বড় হওয়াটা যেন এতদিনে পুরোপুরি উপলব্ধি করা গেল। নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক এতদিনে। না বাড়ির শাসন, না এতকালের মেয়ে হোস্টেলের গুচ্ছের ঝুরিভরা অযৌক্তিক রীতিনিয়মের বালাই।

শালবাগানের মধ্যে চারদিক খোলা, টিনের ছাউনি দেওয়া বিশাল কনভোকেশন হল, বিরাট মঞ্চ। সেখানে নানা অনুষ্ঠানও হত। একবার ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার এল, সুরের জোয়ারে কটাদিন ভেসে থাকলাম আমরা। ওই শালবনেই একটা চমৎকার প্যাগোডা ছিল। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াত সেখানে। জুটিবিহীন সিঙ্গলরা ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াত এধারে ওধারে। শীতের পতঝর দিনে সে শালবনের আলাদা রূপ। ঝরাপাতার নরম কার্পেটে পা ডুবিয়ে হাঁটা। সন্ধ্যের পরে হাজার হাজার জোনাকি ঘুরে বেড়াত চত্বর জুড়ে। অপূর্ব সে শোভা।

হ্যাঁ , এতক্ষণ ধরে আমাদের ইউনিভার্সিটির কথাই বলছি। কেমন লেগেছিল সে বিদ্যাচর্চার স্থানটি এক গ্রাম্য মেয়ের চোখে? পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায়, রাজা রামমোহনপুরে ১৯৬২ সালে স্থাপিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কথা বলছি। শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে প্রায় ৩৩০ একর জায়গা নিয়ে সুউচ্চ আলোকস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে তরাইয়ের গর্ব, বিদ্যাচর্চার পূণ্যভূমিটি। ইউজিসির এফিলিয়েশন পাওয়া আমাদের উত্তরের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এটি। চ্যান্সেলার রাজ্যপাল, আর আমাদের সময় উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। কিছুদিনের মধ্যেই উনি চলে গেলেন এবং এলেন অধ্যাপক প্রসাদ ঘোষ। রাজা রামমোহনপুর নামটি অবশ্য তেমন উচ্চারিত হত না সেখানে। ওই শিবমন্দির নামটাই 'কাফি'। আবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নয়, 'এন বি ইউ'' বা ইউনিভার্সিটি বললে সহজেই

রিক্সাচালকেরাও দুই নম্বর গেট দিয়ে সোজা সাদা ধবধবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে নিয়ে যেতেন। রাজা রামমোহনের মূর্তি, আর প্রচুর গাছপালার রাজত্বের নাম পদ্মজা নাইডু পার্ক , খুব সুসজ্জিত বা পরিকল্পিত মনে হয় নি প্রথম দর্শনে। ভর্তি হওয়া, হোস্টেল সিট পাওয়া ইত্যাদি সবই যথারীতি হল। আর্টস ফ্যাকাল্টি, দোতলায় বাংলা বিভাগ। ইংরাজিসহ অন্যান্য বিভাগগুলো কাছাকাছি। কমার্স ডিপার্টমেন্টও পাশেই। সব বিভাগেই উত্তরের বিভিন্ন জেলার ছেলেমেয়ের সংখ্যাই বেশি। নীচতলায় কোঅপারেটিভ দোকান, সুলভে খাতা পেন বিস্কিট চানাচুর আরও নানান দ্রব্য দিব্যি পাওয়া যায়। গুড গার্ল যারা হরলিক্স, মেরি বিস্কিট, ছোট্ট নারকেল তেলের শিশি, লাক্স সাবান, বাটার, পাউরুটি জ্যাম-ট্যাম কিনত। মাস দুয়েকের মধ্যে বন্ধুদের অনেকেই টিউশনি জোগাড় করে ফেলল। অনেকে স্যারেদের বাড়ি চিনে যাতায়াত শুরু করল; তা সবই ব্যক্তিগত উদ্যমে এবং খানিকটা আড়াল রেখে। আড্ডা গল্প হয় সবাই মিলে কিন্তু এসকল কথা কেউ বলতে চায় না।

আমাদের ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি দুটি লেডিস হোস্টেল রাস্তার দুধারে। ওপারে নিবেদিতা আর এপারে রানি ভবানী। একটা ছোট বাঁক নিয়ে রাস্তাটা লেডিস হোস্টেলের সামনে দিয়ে সোজা চলে গেছে বাঁহাতে গেস্টহাউসটিকে রেখে। বাঁকের মাথায় ফুলে ভরা এক অমলতাস গাছ। রানি ভবানীর দোতলায় ঘর পেলাম কিন্তু আপাতত ডাবল শেয়ারিং। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে সিনিয়র ব্যাচের দিদিরা চলে গেলে তখন একাই থাকা যাবে। পাশের রুমে দার্জিলিংয়ের দুই কন্যা জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের। মালদা, কোচবিহার, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, সিকিম, মণিপুর কত জায়গার সব মেয়ে। কমার্সেই মনে হয় মেয়ের সংখ্যা তখন খুবই কম। টানা বারান্দায় দাঁড়ালে সন্ধ্যের পর ছেলেদের আরকে হোস্টেলেরও ওপারে দূরের তিনধারিয়া পাহাড়ের ঝিকিমিকি আলো চোখে পড়ত, যেন অজস্র জোনাকি ফুটে আছে ফুলের মত। শনশনে হাওয়ায় দুলত সামনের যুবা ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। বাঁকা ছোরার মতো দেখতে তাদের পাতা ঝরে পড়ত মাটিতে। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে উঠত হঠাৎ।

সোশিওলজিতে ওড়িশার ছেলেদের সংখ্যা যেন ছিল বেশি। জিওগ্রাফিতে মণিপুরের বেশ ক'জনকে দেখেছি। তখন সদ্য শুরু হওয়া নেপালি ভাষা বিভাগের অনেক ছেলে মেয়ের সঙ্গেই ভাল বন্ধুত্ব ছিল। জ্বর, সর্দি কাশি আর ছোটখাট রোগের চিকিৎসায় শালবাগানের এধারে হেলথসেন্টারে যাওয়া আর ক্লাসের পরে হেলথসেন্টারের সবুজ মাঠে বসে দেদার আড্ডা। প্রয়োজনে পাকা রাস্তা ধরে অতটা না ঘুরে গিয়ে সামনের সরু পথ ধরে লাইব্রেরি যেতে ভারি ভাল লাগত। বিশাল সে লাইব্রেরির মর্যাদাই ছিল আলাদা, তবে খুব প্রয়োজনীয় কিছু বই ছোট্ট গ্রুপের মধ্যেই ঘোরাফেরা করত, বহু চেষ্টা করেও দর্শন পাইনি সেসব বইয়ের, পড়া তো দূর অস্ত। মনে মনে উপলব্ধি করেছি সেই তখন থেকেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছেলেদের বন্ধুত্বের হিসেবি বা বেহিসেবি বন্ধন গভীর এবং অটুট, সেই বৃত্তে নারীবন্ধুর জায়গা বিশেষ হয় না। হলেও তার হিসেব অন্য।

শালবাগানের মধ্যে চারদিক খোলা, টিনের ছাউনি দেওয়া বিশাল কনভোকেশন হল, বিরাট মঞ্চ। সেখানে নানা অনুষ্ঠানও হত। একবার ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার এল, সুরের জোয়ারে কটাদিন ভেসে থাকলাম আমরা। ওই শালবনেই একটা চমৎকার প্যাগোডা ছিল। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াত সেখানে। জুটিবিহীন সিঙ্গলরা ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াত এধারে ওধারে। শীতের পতঝর দিনে সে শালবনের আলাদা রূপ। ঝরাপাতার নরম কার্পেটে পা ডুবিয়ে হাঁটা। সন্ধ্যের পরে হাজার হাজার জোনাকি ঘুরে বেড়াত চত্বর জুড়ে। অপূর্ব সে শোভা। শালবন পেরিয়ে ওধারে ক্রিকেট মাঠ। নানা ধরনের খেলাধুলো হত সেখানে। ক্রিকেট তো ছিলই। হেলথসেন্টারের উল্টোদিকে ক্যান্টিন। চা, ডিমের ওমলেট,ঘুগনি রুটি পাওয়া যেত। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকত। অতি উত্তম আড্ডাস্থল, সিনেমা, কবিতা, গান, পলিটিক্স কত বিষয় নিয়েই যে কথা তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকত। প্রথমদিন সেখানে ঢুকে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম প্রবল চিৎকার, টেবিল বাজিয়ে গান হাহা হিহি শুনে। সিনিয়রদের তরফ থেকে নতুনদের স্বাগত জানানোর কান ঝালাপালা অভিনব পদ্ধতি ! ছোট থেকে মেয়েহোস্টেলে বড় হওয়া আমার চোখ খানিক ধাক্কা খেত প্রথম প্রথম নানা দৃশ্যে। টাইট জিনস আর অত্যধিক হিল জুতো, শ্যাম্পু করা খোলা চুলের মেয়েদের দেখে বেশ নতুন রকম মনে হত।

ধুলাবাড়ি যাওয়ার একটা চল ছিল তখন। প্রায়ই কেউ না কেউ যেত। সেখানকার ছাতা টুথব্রাশ জ্যাকেট জুতো কিনে আনত। কালোছাতার পরিবর্তে প্রিন্টেড ছাতার খুব চাহিদা তখন। আমাদেরও ডানা ছড়াচ্ছে একটু একটু, শিলিগুড়ি গিয়ে সিনেমা দেখা, হংকং মার্কেটে ঘুরে বেড়ানো। জংশন স্টেশন থেকে টয়ট্রেনে চেপে দল বেঁধে কার্শিয়াং যাওয়া, সবার পকেটের সামান্য পয়সা মিলিয়ে শুধু ডাল আর বাঁধাকপির তরকারি দিয়ে কার্শিয়াং স্টেশনের ক্যান্টিনে ভাত খাওয়া আবার মজা করতে করতে ফিরতি ট্রেনে শিবমন্দিরে ফেরা। স্বল্পদূরেই শুশ্রুতনগর মানে যেখানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ। ডাক্তারি ছাত্ররাও প্রায়ই আড্ডা দিতে আসত আমাদের ক্যাম্পাসে , অনেকেরই বন্ধু বান্ধবীরা এখানে পড়ত।

রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা সমস্ত ছবি প্রজেক্টরের মাধ্যমে একবার দেখানো হল আমাদের। রঙের অমন জোরালো ব্যবহার মনের গভীরে বসে গেল। আমাদের পড়াতেন মাননীয় অশ্রু শিকদার, আমরা ডাকতাম অশ্রুবাবু স্যার। ডায়াসের ওপর এমাথা ওমাথা হেঁটে পড়াতেন, অসাধারণ উচ্চারণ, অপূর্ব ব্যাখ্যা, গভীর পান্ডিত্য। পিনড্রপ সাইলেন্স সমস্ত ক্লাসে। পড়াতেন শিবচন্দ্র লাহিড়ি, প্রণয় কুমার কুন্ডু, টি কে ওঝা, পুলিন দাস এই সব পণ্ডিত স্যারেরা। সবাই খুব পছন্দের ছিলেন এমনটা নয়। সেমেস্টারের দুর্বল নাম্বার দেখে কোনও কোনও স্যারের ওপর রাগ হত খুব।

এভাবেই বছর গড়াল, রাতে ফিরতে দেরি হলে কিচেনের পেছনের দরজা দিয়ে হোস্টেলে ফেরা শিখলাম। শিবমন্দিরের তখনকার সে বাজারে মেস ম্যানেজার হয়ে বাজার করাও শিখে গেলাম; খাওয়ার ছিরি দেখে বোর্ডাররা বেজায় রেগেও গেল, মাসের শেষের গ্র্যান্ড ফিস্টে মাংস মিষ্টি খাইয়েও তাদের মন আর পাওয়া গেল না। সাদামাটা চেহারার সে সময়কার উ ব বি তার প্রকৃতিগত ঐশ্বর্য, চমৎকার সব শিক্ষক, শান্ত সমাহিত পরিবেশ নিয়ে আমাকে একেবারে গ্রস্ত করে রেখেছিল। জন্মগ্রামের সঙ্গে কোথায় যেন তার গভীর মিল ছিল আমি জানি,আমার মনও জানে। আমার সৌভাগ্য দুটি বছর সেখানে পড়েছি , বিশ্বনাগরিক হিসেবে দেখতে শিখেছি নিজেকে। আজন্মলালিত কিছু কুসংস্কার ভেঙ্গে গেছে কখন। মনের জাড্যতা খানিকটা দূর হয়েছে বইকি।

মনে আছে ক্যাম্পাসের কাছেই চাঁদমনি চা বাগানে আমরা প্রায়ই যেতাম, সেখানে সম্ভবত শিবরাত্রির বড় মেলা বসত। আদিবাসি শ্রমিক মহল্লায় অকারণেই ঘুরে বেড়াতাম দল বেঁধে, কেন জানি না। সেই বাগান সেই শ্রমিক মহল্লা তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে বড়লোকের আবাসন আর শপিং মল। বড় ধাক্কা লেগেছে অমাদের চেতনায়। শোষণ কাকে বলে স্পষ্ট দেখলাম, শ্রেণী বিভাজন কাকে বলে চিনলাম। যতই আইন অদালত থাকুক গরীব মানুষ বড় দুঃখে থাকে এদেশে।

উত্তরের এই জ্ঞানপীঠে আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে গভীর জীবনবোধও।

তনুশ্রী পাল

শিলিগুড়ি ঘিরে পর্যটন সার্কিট প্রস্তুত !

স্মৃতি সতত সুখের। যৌবনে আমাদের সবথেকে প্রিয়তম জায়গা বা লোকেশন যাই বলুন ছিল তিস্তার পার ঘেঁষে গভীর শালবনের ভিতরে ব্রিটিশ আমলের কাচে ঘেরা অনবদ্য সেভক বন বিশ্রাম গৃহ। সেই শিলিগুড়ি এখন গায়ে গতরে দৈর্ঘে প্রস্থে বেড়েছে শতগুণ। অতীতের জলছবি হারিয়ে গেছে। বৃথা অন্বেষণ। তবু শিলিগুড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। কাগজপত্রে লোক মুখে শুনতে পাবেন শিলিগুড়ি হল উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহের গেটওয়ে বা তোরণ।

শৈশব থেকে যে শহরটির সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ তার নাম শিলিগুড়ি। তরাইয়ের প্রবীণতম জনপদ। এখানেই আমার বেড়ে ওঠা, ভালোবাসা, সব কিছু। যত দূরে যাই না কেন, কিছুদিন কাটানোর পর মনে হয় বাড়ি চল, মানে শিলিগুড়িতে। কেন এই আকর্ষণ, টান, ভাললাগা— বলে বোঝাতে পারব না। কৈশোরের কথা বাদই দিলাম, যৌবনে ঘরের খেয়ে বনের মোষ যখন তাড়িয়ে বেড়াই তখন যাবতীয় বেড়ানোর গণ্ডী শিলিগুড়ির আশপাশে। স্মৃতি রোমন্থন, বেড়ানোর সাতকাহন বিস্তর লিখেছি, সেইসব চর্বিত চর্বণ পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন শিলিগুড়ি কি বেড়ানোর জায়গা? এটি কি হেরিটেজ শহর? এখানে কি রাজপ্রাসাদ, অলৌকিক দিঘি, প্রাচীন মন্দির ইত্যাদি আছে কি? উত্তর— কিছুই নাই। তাহলে এই শহরের এত গুরুত্ব কেন? বলি, আছে। পাঁচ মিশেলি এই শহরের বয়স কিন্তু শতবর্ষ অনেক আগেই অতিক্রান্ত। বয়স ১১২। ইতিহাস বলে প্রশাসনিক দপ্তর বদল ফাঁসিদেওয়ায়। কয়েক দশক আগে আমরা গো-যানে চেপে হিলকার্ট রোডের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করেছিলাম। সে এক মজার গল্প, স্মরণীয় স্মৃতি। এই শহরের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ পর্যটক জোশেফ

ডালটন হুকার তার লেখা 'হিমালয়ান জার্নালস'-এ।

নানা সুধীজনের লেখাপত্রে শিলিগুড়ির পুরাতন স্মৃতি চিত্র ফুটে উঠেছে কিন্তু পর্যটনের প্রেক্ষাপটে শহরটির যে অপরিসীম গুরুত্ব তেমন আলোকপাত হয় নাই। সম্প্রতি উবাচ নামে একটি সংস্থা 'সুন্দরী শিলিগুড়ি' নামে ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছে। নিজের তাগিদে 'খ্যাপার' মতন ঘুরে বেড়িয়েছি পায়ে পায়ে। একটু উল্লেখ করি। সত্তর দশকে আমাদের হাকিমপাড়ার আদ্যিকালের কাঠের একতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আরেক বাউন্ডুলে বন্ধুকে বগলদাবা করে চলে যাই সুকনা রেঞ্জ অপিসের পাশ দিয়ে সুকনা লেক হয়ে গোলাঘাট, গুলমাখোলা। মহানন্দা অভয়ারণ্যের গভীর বনভূমি। আশির দশকের শুরুতে যতদূর স্মরণে আছে সুবিশাল বুনো হাতির পাল গুলমাখোলার কেবিন রুম আক্রমণ করে এবং তছনছ করে দেয়। স্টেশন মাস্টার প্রাণভয়ে অন্যান্য সঙ্গীসাথীদের নিয়ে দৌড়ে কেবিন ঘরে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে ওই কেবিন ঘর মহানন্দা অভয়ারণ্যের নজর মিনারে পরিণত হয়।

স্মৃতি সতত সুখের। যৌবনে আমাদের সবথেকে প্রিয়তম জায়গা বা লোকেশন যাই বলুন ছিল তিস্তার পার ঘেঁষে গভীর শালবনের ভিতরে ব্রিটিশ আমলের কাচে ঘেরা অনবদ্য সেভক বন বিশ্রাম গৃহ। সেই শিলিগুড়ি এখন গায়ে গতরে দৈর্ঘে প্রস্থে বেড়েছে শতগুণ। অতীতের জলছবি হারিয়ে গেছে। বৃথা অন্বেষণ। তবু শিলিগুড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। কাগজপত্রে লোক মুখে শুনতে পাবেন শিলিগুড়ি হল উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহের গেটওয়ে বা তোরণ। ব্যবসা বাণিজ্যের মক্কা। ঝাঁ চকচকে ঝলমলে বিপণি বিতান, মল কালচারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে শহরটিকে। একদা এই শহরটি গড়ে উঠেছিল যে স্টেশনকে ঘিরে (বর্তমান টাউন স্টেশন) সবকিছু ছাপিয়ে গেছে জরাজীর্ণ হেরিটেজ টাউন চত্বর, বহু জ্ঞানীগুণী দার্শনিক পর্যটক কবি লেখকের স্মৃতি বিজরিত, আজ সত্যি ধুঁকছে।

পর্যটন বা বেড়ানোর প্রসঙ্গে আসি। দেশ বিদেশের পর্যটক টুরিস্ট, গবেষক, ভবঘুরে যারাই আসেন রেলে, বিমানে কিংবা বাসে, পৌঁছেই সরাসরি গাড়িতে চেপে দে ছুট তাঁদের ডেস্টিনেশনে। মানেটা হল এই, ধুর ছাই শিলিগুড়িতে রাত্রিযাপন করে লাভ কী? এখানে কাটিয়ে যাওয়া মানে অযথা পণ্ডশ্রম। শুনতে খারাপ লাগলেও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার স্নেহভাজন প্রদোষের ভাষায়, এখানে হাগামোতা সেরে সব চলে যায় পাহাড়ে জঙ্গলে। নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে দেখবেন পাহাড় জঙ্গলের গাড়ির ড্রাইভার হোটেলের লোকজন প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করছে, বিমানবন্দরেও একই দৃশ্য। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে একই চিত্র। শিলিগুড়ি ছুঁয়ে চলে যাওয়া। টেক রেস্ট, গেট ফ্রেশ। ক্ষণিকের বিরতি মাত্র। অনেক টুরিস্টকে দেখেছি লোটা কম্বল নিয়ে নেতাজীতে ঢুকে চা, টোস্ট খেয়ে হংকং মার্কেটে ঢুকে চরকি পাক। ব্যস এর বেশি কিছু নয়।

পর্যটন বা বেড়ানোর প্রসঙ্গে আসি। দেশ বিদেশের পর্যটক টুরিস্ট, গবেষক, ভবঘুরে যারাই আসেন রেলে, বিমানে কিংবা বাসে, পৌঁছেই সরাসরি গাড়িতে চেপে দে ছুট তাঁদের ডেস্টিনেশনে। মানেটা হল এই, ধুর ছাই শিলিগুড়িতে রাত্রিযাপন করে লাভ কী? এখানে কাটিয়ে যাওয়া মানে অযথা পণ্ডশ্রম। শুনতে খারাপ লাগলেও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার স্নেহভাজন প্রদোষের ভাষায়, এখানে হাগামোতা সেরে সব চলে যায় পাহাড়ে জঙ্গলে। নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে দেখবেন পাহাড় জঙ্গলের গাড়ির ড্রাইভার হোটেলের লোকজন প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করছে, বিমানবন্দরেও একই দৃশ্য। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে একই চিত্র। শিলিগুড়ি ছুঁয়ে চলে যাওয়া। টেক রেস্ট, গেট ফ্রেশ।

১৯১৯ সালের শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার গাড়ী।

আমাদের সৌভাগ্য পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী গৌতম দেব আমার পরম স্নেহভাজন

কিন্তু জানা নেই এই শহরকে ঘিরে পর্যটকদের কী কী উপহার বা খোঁজখবর দেওয়া যায়, যাঁরা শিলিগুড়িতে থেকেই চমৎকার সব জায়গা বেড়াতে পারেন। আমার গর্ব আমার শহরকে ঘিরে। বড় বেদনা ও দুঃখের তরাই সুন্দরী শিলিগুড়ি নিয়ে কোনও ভ্রমণ সংস্থা, ফেসবুক গোষ্ঠী, ভ্রমণ পিপাসু, ভ্রামণিকের কলমে তরাইয়ের বন্দনা বা খবর নেই। সকলেই ডুয়ার্স নিয়ে মাতামাতি করেন। তরাই যেন ব্রাত্য। পাদপ্রদীপের নিচে।

যাই হোক, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু নিবেদন। শুরুতেই বলি ফার ফ্রম ম্যাডিং ক্রাউড— এই শহরের হট্টগোল থেকে দু' পা গেলেই দেখবেন সবুজের হাতছানি মাল্লাগুড়ি, দার্জিলিং মোড় থেকে ডান দিকে বাঁক নিলে বাঁদিকে লোকনাথবাবার সুদৃশ্য মন্দির। শহরের মরুদ্যান যেন সবুজ মণ্ডপ বসুন্ধরা। ডান দিকে খেলনা ট্রেনের লাইন। দাগাপুর তরাইয়ের প্রথম প্রাচীনতম চা-বাগান নিউ চামটা, মোহরগাও, গুলমা, সুকনা বিদ্যাপীঠ। চোখ জুড়িয়ে যায়। হেরিটেজ খেলনা ট্রেনের প্রাচীন নকশাতে তৈরি সুরম্য রেল স্টেশন। খেলনা ট্রেনের সংগ্রহশালা ভিতরে। অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সুকনা থেকে কয়েকটি বাঁক পার হলে রংটং পক্ষীপ্রেমীদের দখলে। ব্রাহ্মমুহূর্তের জন্য ক্যামেরা তাক করে বসে থাকে। বাঁ দিকে অরণ্যের আলোতে ছায়াতে বামনপোখরি, গাড়িধুরা, লংভিউ চা-বাগান, পাংখাবাড়ির পথ। দুধিয়া হয়ে মিরিক। উল্লেখ করতে ভুলে গেছি অপরূপা রমণীয় মধুবনের কথা। আসলে এত কিছু দেখার একটু এলোমেলো হয়ে যায়। গাড়িধুরার বামনপোখরি বনবাংলো মন কেড়ে নেয়। মনে পড়ে হাতি বিশারদ লালজী। লালজী শীত পড়লেই বামনপোখরিতে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন। এখান থেকে যেতেন শোনপুর মেলাতে।

রক্তি নদী পেরিয়ে শিমুলবাড়ি চা-বাগান। ডান দিকে শিমুলবনের ভিতর দিয়ে অসাধারণ রোহিনি যাবার পথ। কার্শিয়াং ছুঁয়ে দার্জিলিং তরাই বা শিলিগুড়ি থেকে বেড়াতে চলুন জংলী বাবার মন্দিরে। বাগডোগরা

শিলিগুড়ির অদূরে মাত্র ৫ কিমি দূরে বেঙ্গল সাফারি উদ্যান বা পার্ক। পূর্বে নাম ছিল সোরিয়া রোবাস্টা। ২৯৭ হেক্টর জমির উপরে অভিনব, অনিন্দ্য সুন্দর খোলামেলা বন্য প্রাণীদের স্বাভাবিক বিচরণ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। গাড়িতে বসে আপনি দেখতে পাবেন ভালুকমামা হেঁটে যাচ্ছেন। ঝোপঝাড়ে দুষ্টু লেপার্ড উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হালুম হালুম ডাকে বাঘিনী ছানাপোনাদের নিয়ে বসে আছে কিংবা খুনসুটি করছে। ভাবাই যায় না ঘিঞ্জি পরিবেশ, হট্টগোল থেকে মুক্ত হয়ে বেঙ্গল সাফারিতে বেড়ানো। এখানে এলে মন ভাল হয়ে যায়।

এখন আধুনিক মোড়কে উজ্জ্বল, ততোধিক শিব মন্দির। রামমোহন নগর, সবুজ শালবন। অক্ষয় মৈত্র সংগ্রহশালা যা না দেখলে উত্তরবঙ্গ বেড়ানো অসমাপ্ত। আর নৌকা ঘাট যেতে কাওয়াখালিতে বিশ্ব বাংলা কারিগরি হাট লোকশিল্পীদের স্থায়ী আস্তানা সরকারি উদ্যোগে এবং মাটিগাড়া বিজ্ঞান ভবন। বাগডোগরায় একদা বাঘের বড় অত্যাচার ছিল। ডুকরে ডুকরে ডাকত, এখন যেখানে বিমানবন্দর। এখন বিলকুল ভোল পাল্টে গেছে। বাগডোগরার বিহার ছাড়িয়ে কমলপুর থেকে সোজা কিছুটা গেলেই বেংড়ুবি চা-বাগান। ফৌজী তল্লাট। তারপর মাইলের পর মাইল সবুজের সমারোহ ত্রিহানা, অর্ড, বেলগাছি, সারাহর, মানঝা, লোহাগড় পুটুং। ডান দিকে টিলার উপরে মেচি নদীর ধারে খয়েরবনি অসাধারণ বনবাংলো। বলুন তো ক'জন পর্যটক খোঁজ খবর রাখেন জ্যোৎস্না রাতে খয়েরবনিতে একবার রাত্রি যাপন করুন হেরিটেজ বনবাংলোয়। বনরোমাঞ্চ উপলব্ধি করবেন।

শিলিগুড়ির কাছে জংলীবাবার মন্দির শুধু দর্শন নয় সামগ্রিক ল্যান্ডস্কেপ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। ঘন জঙ্গলের ভিতরে মন্দিরটির অবস্থান। এই সময় মানে নভেম্বর মাসে মহাকাল বাবাদের বাৎসরিক গেটটুগেদার ঘটে। ডুয়ার্সের হাতিরাও যোগদান করে। নকশাল বাড়ি আসলে ওদের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। একদা টুকুরিয়া ঝাড়। বুড়াগঞ্জে বুনো হাতির পাল আপন মনে ঘুরে বেড়াত এখন মানুষের অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত। বেংড়ুবির জংলীবাবার মন্দির দর্শন করে প্রয়োজনে বেংড়ুবি হোম স্টে-তে রাত্রি যাপন করতে পারেন। শিব মন্দিরে হোম স্টে হোটেল, লজ একসে বড়কর এক পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। আরামসে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে রাত্রি যাপন করুন। হাতের নাগালে বিমানবন্দর। তবে সব থেকে লোভনীয় হেরিটেজ বেংড়ুবি বনবাংলোর চাবি পাওয়া কঠিন। আমি একবারই থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম।

শিলিগুড়ির অদূরে মাত্র ৫ কিমি দূরে বেঙ্গল সাফারি উদ্যান বা পার্ক। পূর্বে নাম ছিল সোরিয়া রোবাস্টা। ২৯৭ হেক্টর জমির উপরে অভিনব, অনিন্দ্য সুন্দর খোলামেলা বন্য প্রাণীদের স্বাভাবিক বিচরণ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। গাড়িতে বসে আপনি দেখতে পাবেন ভালুকমামা হেঁটে যাচ্ছেন। ঝোপঝাড়ে দুষ্টু লেপার্ড উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হালুম হালুম ডাকে বাঘিনী ছানাপোনাদের নিয়ে বসে আছে কিংবা খুনসুটি করছে। ভাবাই যায় না ঘিঞ্জি পরিবেশ, হট্টগোল থেকে মুক্ত হয়ে বেঙ্গল সাফারিতে বেড়ানো। এখানে এলে মন ভাল হয়ে যায়। আমি মাঝে মাঝে যাই। সাফারির মাঝে চমৎকার রেস্তোরাঁয় চা, কফি পকোরা খেতে পারেন। গাছগাছালি আর পাখির কলতানে মুখরিত বেঙ্গল সাফারি।

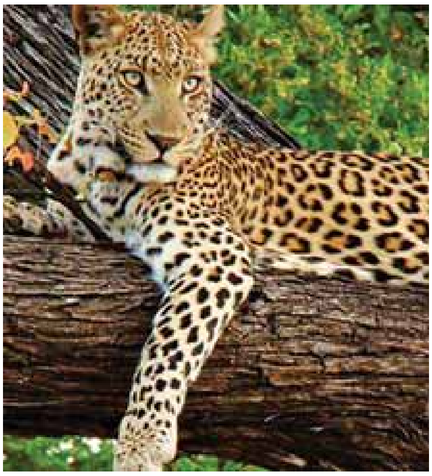

বেঙ্গল সাফারি দর্শন বেড়ানো শেষ করে চলুন না সেবকেশ্বরী কালীবাড়ি। গাড়ি নিয়ে গেলে একটু উঁকিঝুঁকি দিতে পারেন অরণ্যের আড়ালে চমকডাঙ্গী, লালটং, বনবাদারের হাসিকান্নার শরিক হলেন। ওপারে মংপং, থাংলো, তিস্তার অরণ্যের চিত্রমালা। সেবকের ঘিঞ্জি বাজার টপকালে সেবকেশ্বরী কালীবাড়ি। সেবক রেলস্টেশনে দু' চক্কর দিতে পারেন। পাশেই নন্দীখোলা, যৌবনে এখান থেকে পায়ে পায়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে কী ফ্যাসাদ আজ ভাবলেও হাসি পায়। মন্দির থেকে বের হন। দু'পাশে সবুজ পাহাড়। মধ্যিখানে পান্না সবুজ টলটলে জলরাশি। রবিবারে প্রেমিক প্রেমিকাদের বড্ড ভিড়। তাতে কী! আপনি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। মংপং থেকে ডুয়ার্সের বিশাল প্যানোরামা। দুদিক ল্যান্ডস্কেপ। শিলিগুড়ির অদূরে ফুলবাড়ি। তিস্তা ব্যারাজের জলে এই সময়ে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়, কলরব। ফেরার পথে এক হাঁড়ি পান্তুয়া কিনবেন।

শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ২০ কিমি দূরে ভোরের আলো। গজলডোবা মেগা হাব। পাশেই বোরোলি রেস্তোরাঁ। থাকা-খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা। গজলডোবায় নৌকাবিহার। পক্ষীপর্যটন। বিবিধ আকর্ষণ, গজলডোবা থেকে তুষারমন্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা অসাধারণ। চোখ ফেরানো যায় না। গজলডোবার কাছেই সরস্বতীপুর চা-বাগান জঙ্গল। গজলডোবা থেকে মাত্র ৪ কিমি। গজলডোবা থেকে অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারেন ভ্রামরী দেবীর মন্দির, ভবানীপাঠকের মন্দির, বোদাগঞ্জ, দেবী চৌধুরানী কালীমন্দির। অন্য দিকে আপালচাঁদ অরণ্য। কাঠামবাড়ি, মাগুরমারি, ক্রান্তি, ধরলা, নিশানডোবা হয়ে লাটাগুড়ি। ফেরার পথে নামুন সাহুডাঙী রামকৃষ্ণ আশ্রমে। স্বামী ধ্রুবানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। মনে হবে বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশ করলাম। এককথায় অসাধারণ। মন ভাল হয়ে যায় স্বামীজী মহারাজদের আন্তরিক ব্যবহারে। যদি সময় থাকে অবশ্যই দেখবেন ফাড়াসারি জঙ্গল, ডাবগ্রাম, এক টুকরো শালবনে মন্দির। বনদুর্গার আহ্বান।

কলকাতার পরেই শিলিগুড়ির গুরুত্ব। থাকা-খাওয়ার জন্য ধর্মশালা থেকে পাঁচতারা হোটেল লজের ছড়াছড়ি। তাই বলছি একবার এসে তরাই সুন্দরী শিলিগুড়িতে থাকুন। আশপাশের সৌন্দর্যখনি দ্রষ্টব্য স্থলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখুন। ভালো লাগবেই, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৮

নির্বাচিত প্রথম ৬টি ছবি

বিজয়ীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র পাঠানো হবে শীঘ্রই

প্রথম: **বলরাম পাল**

দ্বিতীয়: **শুভজিৎ সেন**

তৃতীয়: **সুদীপ্ত মন্ডল**

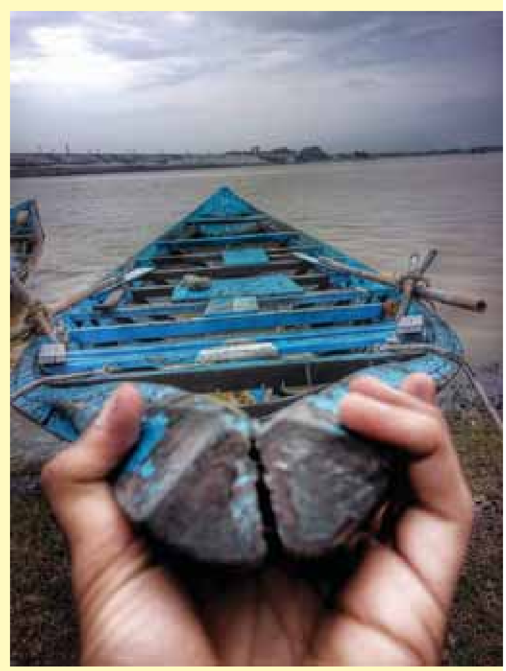

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

পাঠকের কলমে শিলিগুড়ি

সেই সব দিন রাত্তির

তখন তাদের দিন শুরু হত নিউ মার্কেটে (অধুনা বিধান মার্কেট) বেলা দশটা সাড়ে দশটায়। ছাত্র ঠেঙিয়ে একে একে সব মুর্তিমান উদয় হত 'আপ্যায়ন' নামে অতি সাধারণ এক মিষ্টির দোকানে। দোকানের মালিক, আনন্দ'দার অসীম কৃপায় বিপণির পশ্চাদ্দেশে (যেখানে থরে থরে সাজানো থাকত রসগোল্লা, সন্দেশের ট্রে) তাদের একটা ঠেকের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে মক্ষিকাকুলের অবিরাম আনাগোনা। পেছনের ড্রেন থেকে বাহিত হত সম্বৎসরব্যাপী পুতিগন্ধময় সুবাস। তাদের থোড়াই সেসব কেয়ার ছিল! বরং ওই অঞ্চলে চার' পাঁচ-ঘন্টাব্যাপী লেখালেখি নিয়ে বিস্তর আলোচনার, বিনি পয়সায় বসবার অমন একটা খাসা জায়গা পেয়ে তারা বিন্দাস ছিল। জুটে যেত আরও কত স্বপ্ন-দ্যাখা ভাবী শক্তি-সুনীলেরা। তাদের তরফ থেকে দোকানের বিক্রি বলতে তো ১০-১২ টা চা নামে অত্যন্ত মিষ্টি দেওয়া লিকার, চিনি না থাকলে রসগোল্লার রস দিয়েও যা তৈরি হত অবলীলায় এবং তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না ওই ক'জন হবু কবি-গল্পকারের, যাদের গলার শির ফুটে উঠত এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে আলোচনায়। একটা পত্রিকার জন্ম দিতে যাদের টিউশনি করবার টাকা কর্পূরের মতো উবে যেত এবং কী এক ছেলেমানুষি অভিমান ছিল যাদের বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে। অবশ্য কেই বা তখন রাজি হত বলিয়ে-কইয়ে নয় এমন মুখচোরা চার-মুর্তির 'অনিন্দ্য' নামে প্রকাশিতব্য এক পত্রিকার জন্ম সার্থক করবার জন্য রোজগারের টাকা গচ্চা দিতে?

সময়টা আশির দশকের ঠিক আগে। তখন চাকরির জন্য যাদের বিস্তর পরীক্ষা-টরীক্ষা চলছে, 'ভার্সিটি জীবনের জোয়ারে যাদের কয়েকজন তখন ভাসমান। শিলিগুড়ি শহর তখন এত ঝাঁ-চকচকে হয়নি। মিত্র-সম্মিলনী নাটকের প্রেক্ষাগৃহ হিসেবেই সুবিদিত ছিল। সিনেমা হলগুলো রমরম করে চলত। বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব বা বাঘাযতীন ক্লাবের আয়োজনে তিলক ময়দানে সন্ধ্যা-হেমন্ত, মান্না-প্রতিমার মন মাতানো বাংলা গানে শ্রোতারা বিভোর হত। মোদ্দা কথা, শিলিগুড়ি শহরটা তখনও ঠিক আজকের মত বিচিত্র চরিত্তির নিয়ে বড়াই করবার মত যোগ্য ছিল না। রাস্তা ঘাটে বাংলা ভাষার ছররা ছুটত, অবশ্যই শিলিগুড়ি বা নর্থ বেঙ্গলের নিজস্ব আঙ্গিকে।

তো অনেক বিপ্লবের পর, বিষম গর্ভ-যন্ত্রণা সয়ে জন্ম নিল প্রথম সংখ্যার 'অনিন্দ্য'। শাঁখ বাজে নি কোথাও। উলুও দেয় নি কেউ। বগলদাবা করে পত্রিকা নিয়ে চার মুর্তি চলল কলকাতায়। উদ্দেশ্য বোশেখ পঁচিশের ভোরে 'অনিন্দ্য'- প্রচার জোড়াসাঁকো এবং সদন চবুতরায়। দিব্যি মনে আছে, প্রথম সংখ্যার দাম ধার্য হয়েছিল, মাত্তর এক টাকা। আর বিক্রি? সাকুল্যে খান কুড়ি। সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া অধিকাংশ পত্রিকা বিলি পত্তর করে, তাদের মত খ্যাপাটেদের দিয়ে টিয়ে, শিয়ালদহ অঞ্চলে এক অতীব নগণ্য হোটেলে স্নান এবং দ্বিপ্রাহরিক ভোজন অন্তে ফের রাতের দার্জিলিং মেল এবং অবধারিতভাবে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে। এ ওর গায়ে ঢুলে পড়ছিল তারা সারা রাত্তির। বার দুয়েক ঝাল মুড়ি এবং চা। ধুমপায়ীদের ঘুম তাড়াতে চলছিল বিড়িতে দেদার সুখটান। একজনের ওপর আবার রবি ঠাকুর ভর করেন ভীষণ সুখ বা দুঃখের কালে। তিনি তো গান ধরেছেন হেঁড়ে গলায় ভুলভাল সুরে, স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে। এখন মনে পড়লে হাসিতে পেটের নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে আসে। তাদের পাশে ঢুলছিলেন এক মাঝবয়সী মহিলা। গানের গুঁতোয় তিনি চিল্লিয়ে কামরা মাত করে উঠেছিলেন 'এই ছ্যামরারা, কী দিলে তরা চুপ হবি, ক'তো? সঙ্গে লাড্ডু-মোয়া আসে, খাবি নি? নইলে এক্কেরে চুপ থাক। ঘুম আইলে ঘুমা, নয় তো...' আর কিছু শোনার প্রয়োজন ছিল না। বাকি রাতটা বৈশাখের চ্যাটচ্যাটে গরমে, সেদ্ধ হয়ে কাটানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাদের।

সকালবেলায় পৃথিবী জয় করে যেন ফিরলেন বাবুরা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালে যা কপালে জোটে বাঙালি মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেদের, তাই ছিল তাদের পাওনা। বাকি শ দেড়েক 'অনিন্দ্য'র কপি কী হবে, সেটাই ছিল তখন আশু ভাবনা।

'অনিন্দ্য' র তৃতীয় কি চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল অণু-গল্প সংকলন হিসেবে। শিলিগুড়ি এবং বাইরের বেশ কিছু গল্পকার লেখা দিয়ে ধন্য করেছিলেন সম্পাদকদের। তারপর, যা হয় লিট ম্যাগাজিনের ভাগ্যে, তাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয় নি। চাকরি পেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল তারা এক এক দিকে। একজন খড়্গপুর আই আই টিতে। এই অধম থিতু হলেন কলকাতায়। একজন বহরমপুরে। বাকি সর্বশেষজন অভিমান নিয়ে শিলিগুড়িতেই চাকরিতে বহাল হলেন। 'অনিন্দ্য' শব্দহীন হল।

দীর্ঘদিন বাদে এখন যখন আমার স্বভুমিতে যাই, দম বন্ধ হয়ে আসে। একটা শহরের কী দুরন্ত-দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে, শিলিগুড়ি বোধ হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহানন্দাকে নদী বলে ভাবতে কষ্ট হয়। হিলকার্ট রোডের যানজট দেখে, মিছিলে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া সেন্ট্রাল এভিনিউ মনে হয়। দীনবন্ধু মঞ্চে নাটক চলে। চুপচাপ দেখে ফিরে আসি। কলেজ পাড়ায় বইয়ের দোকানে এখনকার লিটল ম্যাগগুলোয় চোখ বুলোতে বুলোতে কিনে ফেলি দু-একটা। খুঁজে পাই নিজেদের ফেলে আসা অতীতকে। তবু মনে হয়, 'যা হারিয়ে যায়...' তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ঠিক তেমনিই এখনও দৃশ্যমান হয় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের লম্বা ফুট ব্রিজ থেকে। হামলে পড়ে ছবি তোলেন পর্যটকরা। হিলকার্ট রোডে দাঁড়ালে তিনি কখনও উঁকি মারেন স্বমহিমায়। রাতে তিনধরিয়া, কার্শিয়াং-এর আলোগুলো জ্বল জ্বল করে। এই বিরলতম দৃশ্য শিলিগুড়ি ছাড়া আর কোন শহরই বা দিতে পারে?

তবু, একটু কষ্ট হয় (সাম্প্রদায়িকতায় দেগে দেবেন না আবার!) বড্ডবেশি কসমোপলিটান হয়ে গ্যাছে শহরটা। কোথায় য্যানো হারিয়ে গ্যাছে বাঙালিয়ানার শিলিগুড়ি।

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

মোয়ামারির বাঁশ বাড়ি

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে তরাই-ডুয়ার্সের আনাচকানাচে অনেক নাম না জানা গ্রাম রয়েছে, তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সৌন্দর্যের ভাণ্ডার, এমন একটি গ্রামে ঘুরে এলাম, জেলা জলপাইগুড়ি অন্তর্গত ময়নাগুড়ির কাছে মোয়ামারি গ্রাম, যেখানে রঞ্জুবাবুর নিপুন শিল্পের ফসল বাঁশের তৈরি আসবাবপত্র এবং সেই ওয়ার্কশপকে কেন্দ্র করে খামারবাড়ি সেটিও বাঁশের তৈরি। তবে এই বাঁশের কুটিরটি সম্ভবত এখনও লাইমলাইটে এসে পৌঁছায়নি।

নতুন বছরের শুরুতে নিত্যদিনের রুটিনমাফিক চলার থেকে বিরতি নিয়ে সপরিবারে রওনা দিলাম মোয়ামারি গ্রামে। ময়নাগুড়ি থেকে টোটোয় চেপে বসলাম, মিনিট কুড়ি সময় লাগল পৌঁছাতে, পিচ রাস্তার দু'পাশে ঘর-বাড়ি পেরিয়ে খেত-খামার, গ্রাম বাংলার প্রতিচ্ছবি খড় বোঝাই গরুর গাড়ি সে-ও এই পথের সঙ্গী। মাঝে মাঝে বট-পাকুড়, জিওল গাছ, বিশালাকার মাথা ঝুঁকে আপনাকে পথ দেখিয়ে চলেছে। শীতের শাক-সবজি পরিচর্যায় ব্যস্ত স্থানীয় মানুষ মাঝে মাঝে ছোট ছোট ডোবা, জল নেই বললেই চলে, মাঝে মাঝে বকের দেখা, মাথা নিচু করে খাদ্যের অন্বেষণে ব্যস্ত, তবে তার মাঝেই মাথা উঁচিয়ে দেখে নিচ্ছে আশপাশ। এসব দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম সেই খামার বাড়ির দরজায়। চারিদিকে বাঁশঝাড় দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত। গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে মাথা নিচু করে, মেঠো পথের দু'দিকের সারি সারি তেজপাতা গাছ, ফুলের সুমিষ্ট সুবাস। এই গাছগুলির ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দু'পাশে বিশালাকার পুকুর তাতে মাছেরা খাবি খাচ্ছে। সামনে এগিয়ে যেতে রঞ্জুবাবু এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

এ কোথায় এলাম, এ যেন প্রকৃতির কোলে শৈল্পিক ছোঁয়ায় দুটি চমৎকার বাঁশের কুটির যার ভিতরে আধুনিকতার মোড়কে থাকার সুব্যবস্থা। এই বাঁশের তৈরি ঘরগুলি সাত বছর আগে বানানো। টিলার উপর দু'কোণে দুটি কটেজ যা সম্পূর্ণ বাঁশের তৈরি, এ যেন ছবির মত অবিশ্বাস্য। ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি বাঁশের চাটাই দিয়ে মেঝে, দেওয়াল, সেই সঙ্গে চোখ জুড়ানো আসবাবপত্র। জানালা দিয়ে নিচে তাকালে চারিদিকে পুকুর পরিবেষ্টিত, 'মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে'।

সামনে পুকুরের পাশ দিয়ে একটি পাথর বাঁধানো সিঁড়ি উঁচু টিলার উপর উঠে গেছে, সেখান দিয়ে উপরে উঠেই মনে হল এ কোথায় এলাম, এ যেন প্রকৃতির কোলে শৈল্পিক ছোঁয়ায় দুটি চমৎকার বাঁশের কুটির যার ভিতরে আধুনিকতার মোড়কে থাকার সুব্যবস্থা। রঞ্জুবাবু জানালেন, এই বাঁশের তৈরি ঘরগুলি সাত বছর আগে বানানো, কিন্তু এত সুন্দর করা হয় যে দেখে মনে হচ্ছে এই তো সেদিন বানানো। টিলার উপর দু'কোণে দুটি কটেজ যা সম্পূর্ণ বাঁশের তৈরি, এ যেন ছবির মত অবিশ্বাস্য। ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি বাঁশের চাটাই দিয়ে মেঝে, দেওয়াল, সেই সঙ্গে চোখ জুড়ানো আসবাবপত্র। জানালা দিয়ে নিচে তাকালে চারিদিকে পুকুর পরিবেষ্টিত, 'মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে'। আরও দূরে চোখ গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতছানি, শীতের সকালে নীল আকাশের সঙ্গী রূপে তার দেখা মিলতে পারে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে কুঁ ঝিকঝিক করে ট্রেনের হুইসেল শুনতে পাওয়া যায়।

টিলার উপর একটি ছাতিম গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া দান করছে, তার নিচে বাঁশের বেঞ্চ সহকারে

টেবিল সাজানো, জনা কয়েক সঙ্গীসাথী গেলে সন্ধেবেলায় এখানে বসে জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য এই বসার জায়গাটির জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া কলমের আমগাছ, পাতাবাহার দিয়ে সাজানো, সেই সঙ্গে রয়েছে মরশুমি ফুলের সম্ভার। তবে আড্ডা দেওয়ার জন্য বা নির্জনে বসে প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলার জন্য একটি নজর মিনার রয়েছে, সেটাও বাঁশেরই তৈরি আর বাঁশের টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো। হঠাৎ নজরে এল ছোট ছোট ঝুড়ি কার্ণিশে ঝোলানো, যার মধ্যে পাখির ছানাদের নিরাপদে রেখে মায়েরা খাবারের সন্ধানে যায়।

এখানে বসে আড্ডা দেওয়ার থেকে চুপ করে পাখিদের কলতান শুনতে বেশি ভাল লাগে। নিচে বিশালাকার পুকুর, তাতে 'হাঁসগুলো ভেসে ভেসে করে কোলাহল'। রঞ্জুবাবুর থেকে জানা গেল, এই এক একটি পুকুরে কোনওটায় বড় মাছ আবার কোনওটায় মাছের চারা চাষ করেন। এই মাছ দিয়েই অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। একথা সেকথার ফাঁকে এলাচি চায়ের সঙ্গে অতিথি আপ্যায়ন করতেভোলেননি। এরপর তাঁর বাঁশের ওয়ার্কশপ ঘুরে দেখলেন, তিনি তার সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে বাঁশ দিয়ে নিজের ডিজাইন করা আসবাবপত্র তৈরি করেন যা বর্তমান যুগের আধুনিক আসবাবপত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রস্তুত, গ্রামের বেশ কিছু মানুষ তাঁর এই ওয়ার্কশপে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বললেন, যখন তিনি ক্লাস টু-থ্রি তে পড়েন সেই সময় থেকে বাঁশের প্রতি তার ভালবাসা, নিত্য নতুন ডিজাইন নিজের মনে শৈল্পিক ছোঁয়ায় আসবাব তৈরি করেন। অসাধারণ তাঁর শিল্পকর্ম।

এই খামারবাড়িতে গরু থাকায় তিনি বয়ো গ্যাস দিয়ে জ্বালানির চাহিদা মেটান। সবকিছুই তিনি নিজের হাতে করেন, পুকুরের ধার দিয়ে শাক সবজি চাষ করেন। এই পুকুরের ধারে বসার সুব্যবস্থাও রয়েছে, টালি মোড়ানো সিমেন্টের বেঞ্চ আর মাথার উপর খড়ের ছাউনি। পুকুরের মধ্যে বেশ কিছু বাঁশ জলে ডোবানো রয়েছে, কৌতুহলবশত জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, এই বাঁশ দিয়ে আসবাব তৈরি করলে কোনওদিন পোকার দ্বারা ক্ষতি হবে না। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই ব্যাম্বু হাট বা বাঁশ বাড়ি। ভবিষ্যতে আরও একটি ব্যাম্বু হাট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে সেটাও জানালেন। তবে পর্যটকের সংখ্যা বেশি হলে তিনি তাঁবু বা টেন্টের ব্যবস্থা করে দেন।

নিঝুম রাতে দূরে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা আলো, জোনাকির আলো আর মাঝে মাঝে কু ঝিকঝিক সব মিলিয়ে মায়াবী রাত। নির্জনে নিরালায় ব্যস্ততাকে ছুটি দিয়ে এক দু'দিন কাটানোর জন্য আদর্শ। তাঁর দেওয়া হাতের তৈরি ছোট্ট বাঁশের তৈরি পাখি বোনকে উপহার দিলেন এবং তাঁর ব্যবহারে আমরা আপ্লুত।

রঞ্জুবাবুর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফসল এই ব্যাম্বু হাট যা নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। তাই একবারটি এই উত্তরের তরাই অঞ্চলের গ্রামে এসে থাকা যেতেই পারে। কাছেপিঠে দেখার জন্য রামসাই পর্যটন কেন্দ্র এছাড়া জল্পেশ মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির, বটেশ্বর প্রভৃতি মন্দির পরিবেষ্টিত ময়নাগুড়ি এখানে থেকে অনায়াসে দর্শন করা যায়।

বাসে ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি স্টপেজে নেমে টোটোতে যাওয়া যায়। বাইরের অতিথিদের জন্য নিকটবর্তী স্টেশন ময়নাগুড়ি। রঞ্জিত রায়-এর ব্যাম্বু হাট, ফোন ৯৯৩২৮৬২৪১২।

আর হাতে সময় পেলে একদিন ঝাঝাঙ্গি ধাবায় দুপুর বা রাতের খাবার খেয়ে দেখতে পারেন। যে অবাক ধাবায় মদ বিক্রি হয় না, ডিম ছাড়া সব নিরামিষ খাবার এবং একসঙ্গে বহু লোক বসে খাওয়ার বিপুল আয়োজন। তার গল্প না হয় আরেকদিন শুনবেন!

দেবলীনা দে

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

গর্ভস্থ শিশু পুত্র না কন্যা জানতে সায় দিলে আইনের চোখে অপরাধী গর্ভবতীও

ভারতে কন্যাভ্রূণ হত্যার মত ঘৃণ্য অপরাধ বহুকাল যাবৎ নারীদের বিরুদ্ধে নীরবে ঘটে চলা অপরাধ, ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। পূর্বে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকৌশলগুলি উন্নত ছিল না, তাই জন্মের আগে শিশুটির লিঙ্গ নির্ধারণ করা অসম্ভব ছিল। সেই আমলে জন্মের পর শিশু কন্যাটির দুধে আফিম মিশিয়ে, লবণের পুঁটুলি মুখে ঠেসে দিয়ে কিংবা বাচ্চাটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হত। কখনও আবার শিশুটিকে খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি না দিয়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে অযত্ন করে, ধীরে ধীরে মেরে ফেলা হত। বর্তমানে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বিকৃত ব্যবহার দ্বারা আরও অত্যাধুনিক বাতাবরণে এই অপরাধ প্রবল উদ্যোমে সংঘটিত হচ্ছে। হতাশাজনক হলেও, এটাই সত্য যে এই বৈজ্ঞানিক কৌশল দ্বারা যেমন মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থান, বিকলাঙ্গতা, রোগ নির্ণয় করা সম্ভব, ঠিক তেমনি এই প্রযুক্তিকে এখন প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও তার ফলশ্রুতিতে কন্যাভ্রূণ হত্যার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে। তাই মাতৃজঠরে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক কৌশল আবিষ্কারের ফলে আশির দশক থেকে দ্রুত গতিতে আমাদের দেশের আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ কেন্দ্র বা পরীক্ষাগার। স্বভাবতই এতে বিপদজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কন্যাভ্রূণ হত্যা।

পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই শিশু কন্যাদের মর্যাদা ও অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের দেশে রয়েছে Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act– ১৯৯৪।

এই আইন কী বলে?

১) ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে বেআইনি। গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য কোন গর্ভবতী মহিলার ওপর কোন প্রকার পরীক্ষানিরীক্ষা করা বেআইনি।

২) কেবলমাত্র গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রোমোজোমগত ত্রুটি, জিনগত ত্রুটি, জিনগত অসুখ প্রভৃতি নির্ণয় করতে জন্মপূর্ব রোগনির্ণয়সংক্রান্ত কৌশল গর্ভবতী মহিলার ওপর প্রয়োগ করা যাবে। তবে এই বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তগুলির মধ্যে অন্তত একটি শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যিক -

ক) গর্ভবতী মহিলার বয়স ৩৫ বছরের বেশি।

খ) সেই মহিলার পূর্বে দুই বা তার অধিক বার স্বতঃস্ফূর্তভাবে (পরিকল্পিত নয়) গর্ভপাত বা ভ্রূণমোচন ঘটেছে।

গ) মাদকদ্রব্য, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, সংক্রামক রোগ, রাসায়নিক প্রভৃতি বিপদজনক বস্তুর সংস্পর্শে এসেছেন সেই মহিলা।

ঘ) সেই মহিলা বা তাঁর স্বামীর পরিবারে মানসিক প্রতিবন্ধকতা বা বিকলাঙ্গতার মত জিনগত রোগের ইতিহাস আছে।

ভারতে বিগত তিন দশকে ১ কোটি ২০ লাখ কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে! ভারতে গর্ভপাত জনিত কারণে প্রতিবছর ছয় লাখের মত শিশু কন্যা মারা যায় এবং এটি সহজেই অনুমেয়, এগুলো স্রেফ দুর্ঘটনা নয়। যে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে আজও কন্যার জন্ম হলে কোন উৎসব হয় না, সেই দেশের বহু শিশু কন্যা যে পৃথিবীর আলো দেখতেই পাবে না, এ আর আশ্চর্য কী!

তবে এই পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি কখনই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য করা যাবে না।

৩) জেনেটিক কাউন্সেলিং সেন্টার, জেনেটিক ক্লিনিক, জেনেটিক ল্যাবরেটরি, এবং আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিক বা ইমেজিং সেন্টার, যেখানে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণে সক্ষম আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন বা ইমেজিং মেশিন রয়েছে - এই আইনে উপরোক্ত সবগুলি কেন্দ্রকে নিবন্ধন করতে হবে। যে সমস্ত ফার্টিলিটি সেন্টার গর্ভধারণপূর্ব লিঙ্গ নির্বাচন কৌশল ব্যবহার করতে সক্ষম, তাদেরও নিবন্ধিত হতে হবে। আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন যুক্ত গাড়িকেও নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক।

৪) যদি পরীক্ষা করা আবশ্যিক হয়, সেক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার লিখিত অনুমতি নিতে হবে। সেইসাথে এই পরীক্ষার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁকে জানাতে হবে। এই অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব যিনি পরীক্ষা করবেন তাঁর।

৫) এই পরীক্ষার সাথে যুক্ত কোন ব্যক্তি যদি সেই গর্ভবতী মহিলাকে বা অন্য কেউকে ভ্রূণের লিঙ্গ পরিচয় দেন, তবে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। অপরাধীদের তালিকায় আছেন- ডাক্তার, প্রকর্মী, তাঁদের সাহায্যকারী এবং আবেদনকারী স্বয়ং। গর্ভবতী মহিলা যদি স্বেচ্ছায় এই পরীক্ষা করতে আবেদন করেন, তবে তিনিও অপরাধী। যিনি তাঁকে পরামর্শ দেবেন, কিংবা বাধ্য করবেন ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে, তিনিও অপরাধী। গর্ভবতী মহিলা যদি প্রমাণ করতে পারেন পরীক্ষায় তাঁর সম্মতি ছিল না, স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির অন্য কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা বাধ্য হয়ে তাঁকে সম্মতি দিতে হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাঁকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না।

৬) এই আইনভঙ্গকারী চিকিৎসক বা প্রকর্মী বা সহায়কদের তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড আর দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। যদি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা করবার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান ও পেশাদারের সহায়তা চাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনকারী ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

৭) কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, জেনেটিক কাউন্সেলিং সেন্টার, জেনেটিক ক্লিনিক বা জেনেটিক ল্যাবরেটরি দ্বারা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা বিতরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দোষী ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড আর দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

বর্তমানে মঞ্চ বা পথ নাটক, বিভিন্ন গণমাধ্যম, বেটি বাঁচাও কর্মসূচী, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে আইনি সচেতনতা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্বিচারে কন্যাভ্রূণ হত্যা ঘটে চলেছে এই দেশের মাটিতে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যা ভ্রূণ হত্যার বেআইনি ব্যবসা রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে বহু ক্লিনিক। এই অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি একটি অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক অবস্থার দিকে আমাদের সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে জনসংখ্যার পুরুষ-মহিলা অনুপাতে ভয়ঙ্কর অসাম্যের উদ্রেক হচ্ছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, প্রতি ১ হাজার পুরুষের বিপরীতে নারী রয়েছেন ৯৪০ জন। ব্রিটিশ চিকিৎসা সাময়িকীর ২০১১ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে বিগত তিন দশকে ১ কোটি ২০ লাখ কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে!

ভারতে গর্ভপাত জনিত কারণে প্রতিবছর ছয় লাখের মত শিশু কন্যা মারা যায় এবং এটি সহজেই অনুমেয়, এগুলো স্রেফ দুর্ঘটনা নয়। যে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে আজও কন্যার জন্ম হলে কোন উৎসব হয় না, সেই দেশের বহু শিশু কন্যা যে পৃথিবীর আলো দেখতেই পাবে না, এ আর আশ্চর্য কী! তবে সমাজ থেকে এই পাপের শিকড় উপড়ে না ফেলা হলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চিহ্নকরণের জন্য দায়ী হয়ে থাকব আমরা। এছাড়া, কন্যাভ্রূণ হত্যার ফলে নারীদের বিরুদ্ধেও অপরাধ ক্রমবর্দ্ধিত হবে। তাই পুরুষ সন্তান আসক্তি, পণপ্রথা কিংবা বিজ্ঞানের বিকৃত ব্যবহার প্রভৃতি যে কারণই থাক না কেন, এই ক্রমক্ষয়িষ্ণু সমাজের সর্বপ্রকার ব্যাপ্তির মধ্যে কন্যাভ্রূণ হত্যার কুপ্রভাব বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সকলের প্রতি আবেদন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকুন, লিঙ্গ বৈষম্য রোধে সচেষ্ট হন, অন্যদের সচেতন করুন এবং অনাগত সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের অবৈধতা ও কুপ্রভাব সম্পর্কিত বার্তাটি চারিদিকে ছড়িয়ে দিন। কারণ, যতদিন না সাধারণ মানুষ শিশু কন্যার মূল্য অনুধাবন করতে পারবেন, ততদিন এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হবে না।

রাখি পুরকায়স্থ (আইন বিশেষজ্ঞ)
rakhe.pur@gmail.com

নাট্যচর্চায় এক যুগ পেরিয়ে সম্পূর্ণ মেয়েদের একটি দল

শ্রীমতী ডুয়ার্স

তন্দ্রা চক্রবর্তী, রীণা ভারতী এবং কৃষ্ণা চক্রবর্তী মিলে শুরুটা হয়েছিল ২০০৬ এ। পরের বছর রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পাকাপাকিভাবে কাজে নেমে পড়ার অঙ্গীকার। জলপাইগুড়ি শহরের পুরোপুরি মহিলা-পরিচালিত ও মহিলা-অভিনীত একটি নাটকের দল 'দর্পণ' কাজ শুরু করেছিল পথনাটক দিয়ে। ২০০৮ থেকে মঞ্চ নাটক। অনেক নাটক এবং অনেক শো এর ভাল মন্দ অভিজ্ঞতা নিয়ে দশ বছর অতিক্রান্ত। এখন সদস্য সংখ্যা সতের। সম্পাদনার দায়িত্ব সেই শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত দক্ষ হাতে সামলে চলেছেন তন্দ্রা চক্রবর্তী। দশ বছরের চলার পথে নাটক করেছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ধুপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, গয়েরকাটা, ক্রান্তি, শলশলাবাড়ি, মাথাভাঙ্গা, রায়গঞ্জ, মালদা আরও নানা জায়গায়। কলকাতার শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ এবং মুক্তাঙ্গন এ, সেই সাথে পার্শ্ববর্তী কাকদ্বীপ আর হাওড়াতেও। নাটক নিয়ে এবারের পরিকল্পনায় রয়েছে দীঘা, চাকদা আর বালি। নিজের রাজ্যের বাইরেও চলে গিয়েছে এই দল। দিল্লি, গৌহাটি এমনকি ভাগলপুরেও। জলপাইগুড়িতে নিজেদের ও বাইরের দলের শো-র আয়োজন করেছেন একাধিকবার।

প্রত্যেকের আত্মনিবেদন না থাকলে একটা দল চলতে পারেনা। এখানেও তাই হয়েছে। তন্দ্রা চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম সদস্যদের মধ্যে মতান্তর হয় ঠিকই কিন্তু মনান্তর হয় না কখনও। সকলের প্রচেষ্টায় পুরস্কারের ঝুলিও ভরে উঠছে ধীরে ধীরে। ভাগলপুরে অল ইন্ডিয়া ড্রামা কম্পিটিশনে বেস্ট ডিরেকশন, বেস্ট অ্যাকট্রেস, সেকেন্ড বেস্ট প্রোডাকশন এর পুরস্কার পেয়েছে 'দর্পণ'। বিভিন্ন জাতীয় স্তরের নাট্য-উৎসবে নাটক করে এই দল প্রশংসিত হয়েছে এতটাই যা তথাকথিতপুরস্কারের চাইতে কোনও অংশে কম নয়। ইচ্ছে আছে, তাঁরা তাঁদের নাটক নিয়ে দেশের বাইরেও পা রাখবেন। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই।

শুধু নাটকই নয়, কখনও কবিতা কোলাজ, আলেখ্য, সমবেত গান সবই আনন্দের সঙ্গে করেন তাঁরা। বিভিন্ন সচেতনতামূলক নাটকও চলে এর পাশাপাশি। শিশুশ্রম বন্ধ করা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ ইত্যাদি। রিহার্সাল, শো, কখনও টিকিট বিক্রি, কখনও গাড়িতে বা ট্রেনে লম্বা সফর এসব কিছুই করতে হয় প্রত্যেকের নিজেদের সংসার নামক জটিল কর্মক্ষেত্র সামলেই। সবটাই আনন্দের সঙ্গে করলেও আর্থিক সমস্যা বড় পীড়া দেয় মাঝে মাঝেই। যদিও সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছেটাই প্রধান বলে এগিয়েও চলেছে ঠিকঠাক। ভবিষ্যতেও এগিয়ে চলবে এ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু পাশে চাই সকলের ভালবাসা আর শুভ কামনা।

নিজস্ব প্রতিবেদন

---

২২ পৃষ্ঠার পর

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৮

নির্বাচিত প্রথম ৬টি ছবি

যুগ্ম তৃতীয়: **তনুজ মল্লিক**

চতুর্থ: **রাজু দাস**

পঞ্চম: **জয়ন্ত ঢ্যাং**

ছুটে ছুটে যে আকাশটা ধরতে চাইতাম

গ্রামটার নাম বাতাসী, ওই গ্রামেই আমাদের চা-বাগান ‘সতীশ চন্দ্র টি এস্টেট’। এই বাগানের ডিভিশন ছিল দৌলতপুর, যা এখন পানিট্যাঙ্কি নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের এই চা-বাগানে আমার বড় হয়ে ওঠা। মেয়েবেলা লিখতে বসে বড় বেশি স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েছি। মনের পরতে পরতে জমা ছিল যত রংবেরঙের সোনালি দিন একে একে ডানা মেলে দিল চোখের সামনে।

খুব সুন্দর ছিল বাগানটা, চারিদিকে সবুজে সবুজ। দূর থেকে দেখলে মনে হত কোনও এক অদৃশ্য হাতে কে যেন একটা সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে দিগন্ত বিস্তৃত করে। আর ওই যে সবুজের শেষ যেখানে সেখানে এসে মিশেছে ঘন নীল আকাশ। ছোট বেলায় মনে হত একটু দৌড়ে গেলেই হয়ত আকাশটা ছুঁতে পারব। বাগানের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে ছুটতাম আকাশ ধরতে। আমাদের ছোটো যত বাড়ত, আকাশ ততই উপরে উঠত। তখন বুঝতাম না আকাশ ধরা যায় না। কখন যে হাত ধরাধরি করে ছোটা বন্ধ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম ছোটবেলা শেষ, মেয়েবেলা এসে গেছে।

মনের আকাশে তখন রঙের আঁকিবুকি। লম্বা ঘাসের ডাঁটির ওপর ফড়িংয়ের দোল খাওয়া। রঙিন প্রজাপতির ডানা মেলে ওড়া, গুন গুন গুঞ্জনে মৌমাছির বাসা বদল সবই তখন ভাল লাগে। প্রতিটি ঋতুকে আলাদাভাবে অনুভব করি। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ‘ছায়াসুনিবিড়’ মন্দিরের বারান্দায় সকলে মিলে অবসর যাপন। বর্ষার ঘন কালো মেঘ আর সবুজ প্রান্তর একাকার। প্রকৃতি যখন ‘বর্ষণ মুখরিত’ আমার হৃদয় দিগন্তও তখন বর্ষায় আলোড়িত। মনের জলতরঙ্গ তোলে ‘মেঘমল্লার’ সুর। শরতে কাশের সমারোহ আর শিউলি সুবাস বাজনা বাজায় মনের অলিন্দে। মনমাতান বকুল গন্ধে হেমন্তের এক একটা বিকেল মোহময় হয়ে ওঠে। ঝিল্লিমুখর পৌষের রাত শীতে জর্জর। ভোরের কুয়াশা ভেঙে শিশু সূর্যের আলোর ছটা মন রাঙায়। তখন ফাগুন আনত মনে রঙের আগুন। মেয়েবেলার রং-ও একটু একটু করে বদলাতে থাকে।

মেয়েবেলার কথা লিখতে বসে পুরনো স্মৃতির ঝাঁপি থেকে এক একটা ছবি পর পর উঠে আসছে মনের আয়নায়। বিশেষ এক একটা মুখ স্মৃতির আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে যায়। মনের জানালা খুলে যে স্মৃতিগুলো প্রখর হয়ে উঠছে তারই কয়েকটা ঘটনা মেলে ধরি, এতে হয়ত তখনকার সমাজের কিছুটা চালচিত্র বোঝা যাবে।

ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

কোনও কারণে সেদিন বাস বন্ধ। কোনও উপায় নেই বাড়ি ফেরার, আমরা হাঁটা ধরলাম। নকশালবাড়ির স্টেশন পেরনোর পর লোকালয় কমে গেল। নভেম্বর মাস। ধীরে ধীরে দিনের আলোটুকুও নিভে এসেছে প্রায়। কাঁদছি আর দৌড়াচ্ছি। প্রসাদুজোতের কাছে যখন এসেছি আর পারছি না। কান্নাকাটি জুড়েছি সবাই। একজন রাজবংশী দাদু বলেন— ‘তোরা হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিস?’

আমাদের সবার ননীবালা দিদার কথা দিয়ে শুরু করি। তখন তো কথায় কথায় ডাক্তার পাওয়া যেত না। দিদার কাজ ছিল প্রতিদিন ভোরবেলায় আনারসের পাতার নীচের দিকের সাদা অংশটা থেঁতো করে সেই রস ঘরে ঘরে গিয়ে খাওয়ানো, তাতে নাকি কৃমি হয় না। সজনে পাতার রস খাওয়াতেন যাদের প্রেসার ছিল। থানকুনি পাতার রস পেট খারাপের জন্য। বয়ঃসন্ধিক্ষণের চঞ্চলতার কী কু-প্রভাব পড়ে সেটা এত সুন্দর করে বোঝাতেন তা আজও মনে আছে। ধাত্রী বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মাঝ রাতে বা শেষ রাতে যখনি ডাক পড়ত তিনি ছুটতেন। শুনেছি ওনার হাতে প্রায় ২০০ জন শিশুর জন্ম হয়। তাঁকে সবাই দেবীর মত সম্মান করত।

এবার একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা বলি, সারা স্কুলে মাত্র তিনজন মাস্টারমশাই ছিলেন। কী যত্ন নিয়ে শেখাতেন সবাইকে। কে স্কুলে যাচ্ছে না, কে পড়া করছে না সব দিকেই তাদের খেয়াল থাকত। একবার অ্যানুয়াল পরীক্ষার আগে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। মাস্টারমশাই প্রতিদিন সন্ধেবেলায় এসে আমাকে পড়াতেন। একদিন মা বলেছিলেন— ‘মাস্টারমশাই আপনি রোজ এসে পড়িয়ে যান, কত সময় নষ্ট হয়, আপনার কষ্টও হয়। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাই আপনাকে’। উত্তরে তিনি বলেছিলেন— ‘আমরা হলাম মানুষ গড়ার কারিগর। অর্থ নিলে স্বার্থ এসে যায়, তখন সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে’। শিক্ষকের কাজ বৃত্তির বিনিময়ে নয়, ওটা ব্রত হওয়া উচিৎ। আজ ভাবলে অবাক লাগে, তখনকার শিক্ষকরা সত্যি দরিদ্র ছিলেন, তবু তাঁরা ব্রত নিয়েছিলেন মানুষ গড়ার। মনের ভেতরে লালন করতে করতে আজও মাস্টারমশাইদের মুখ অমলিন হয়ে আছে আমার মনে।

প্রতি রবিবার ছুটির দিনে সকাল দশটার পর কী করব তার একটা ছক তৈরি হত আগে থেকে। আমাদের মন্টুদার মাথা থেকে বেরত সব।

এক রবিবার ঠিক হল আমরা বাতাসী নদীর উৎস সন্ধানে বেরবো। বেসুরে ‘ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা’ গাইতে গাইতে নদীর মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছি। কোথাও গোড়ালি ভেজা জল তো কোথাও হাঁটু জল। বেশ মজা হচ্ছিল। হঠাৎ পথের ধারে এক আইসক্রিমওয়ালাকে দেখে মন্টুদা রণে ভঙ্গ দিল। তাকে ডেকে আনা হল বাড়িতে। সবাই একটা করে রংবেরঙের

আইসক্রিম নিল, কাঠি আইসক্রিম। মা'র কাছে পয়সা থাকত না তাই আমি বাদ পড়লাম। আমি কোনও বায়না করিনি, চেয়েছিলাম মাত্র। বেশ মনে আছে সেদিনটা ছিল পয়লা বৈশাখ। আইসক্রিমওয়ালা মা-কে বলে— 'মাইজি আমি খুকিকে একটা আইসক্রিম দিই, পরের বার এসে পয়সা নেব'।

—দ্যাখো আসবে তো পয়সা নিতে, তবেই দাও।

—জরুর আসব মাইজি, পয়সা তো নিতেই হবে।

সে কিন্তু আর আসেনি কোনওদিন। তখন এত বৈশাখি ঘটা ছিল না। সারা জীবনে অনেক দামী দামী উপহার পেয়েছি। কিন্তু আমার মেয়েবেলার পয়লা বৈশাখের ওই উপহারটা আমার জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার।

আর একটা ঘটনা, সালটা ছিল ১৯৬৭ কিম্বা ৬৮। তখন নজরুল আন্দোলনে দেশ উত্তাল। আমি তখন নকশালবাড়িতে নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে পড়ি। বাগান থেকে প্রায় ৮-৯ জন ছেলেমেয়ে বাসে যেতাম। সারা দিনে দুটো বাস ছিল যাতায়াত করার জন্য। কোনও কারণে সেদিন বাস বন্ধ। কোনও উপায় নেই বাড়ি ফেরার, আমরা হাঁটা ধরলাম। নকশালবাড়ির স্টেশন পেরনোর পর লোকালয় কমে গেল। নভেম্বর মাস। ধীরে ধীরে দিনের আলোটুকুও নিভে এসেছে প্রায়। কাঁদছি

মনের আকাশে তখন রঙের আঁকিবুকি। লম্বা ঘাসের ডাঁটির ওপর ফড়িংয়ের দোল খাওয়া। রঙিন প্রজাপতির ডানা মেলে ওড়া, গুন গুন গুঞ্জনে মৌমাছির বাসা বদল সবই তখন ভাল লাগে। প্রতিটি ঋতুকে আলাদাভাবে অনুভব করি। ভোরের কুয়াশা ভেঙে শিশু সূর্যের আলোর ছটা মন রাঙায়। তখন ফাগুন আনত মনে রঙের আগুন। মেয়েবেলার রং-ও একটু একটু করে বদলাতে থাকে।

আর দৌড়াচ্ছি। আমাদের মধ্যে সব থেকে বড় ছিল খেলাদি। ক্লাস নাইন-এ পড়ত। সবচেয়ে ছোট বিমল ক্লাস ফোর-এ। প্রসাদুজোতের কাছে যখন এসেছি আর পারছি না। কান্নাকাটি জুড়েছি সবাই। একজন রাজবংশী দাদু বলেন— 'তোরা হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিস?'

খেলাদি বলে— বাস নেই, বাতাসী যাব।

—ওরে বাবা, পানিট্যাঙ্কির জঙ্গলের বাঘ আর ডাকাত দুই তোদের শেষ করবে। দাঁড়া দেখি কী করা যায়। গ্রামের ভেতরে গিয়ে পাঁচজনকে নিয়ে আসেন, সাথে পাঁচটা সাইকেল। সামনে পেছনে বসিয়ে আমাদের পৌঁছে দিলেন যার যার বাড়িতে। তাঁদের আমরা কেউই চিনতাম না। তখন মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ছিল প্রখর। আজও ভুলিনি তাদের।

তখন যে কোনও বাড়ির বড়রা যে কোনও বাচ্চাকে শাসন করতে পারত। সমাজটা ছিল বৃহৎ পরিবারের মত।

একদিন শুনতে পেলাম আমার মেয়েবেলা শেষ হতে চলেছে পড়াশোনা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে 'জানা হতে অজানায় দিতে হবে পাড়ি'।

হারিয়ে গেল সব— ঘাসের ডাঁটিতে দোল খাওয়া ফড়িং শিউলির সু-বাস। চায়ের মন মাতানো ম-ম গন্ধ। 'নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা' সব-সব হারিয়ে গেল। ফুল মালায় সাজানো সাদা অ্যাম্বাস্যাডার আমায় নিয়ে ধূলো উড়িয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসীর বাঁকে। মেয়েবেলা পড়ে রইল সবুজ বনানীর ভেতরে। নব অধ্যায় হল শুরু।

তপতী ঘোষ

কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভাল ২০১৮

কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভাল ২০১৮

১২-১৬ ডিসেম্বর, রবীন্দ্র ভবন, কোচবিহার

আয়োজক: কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ

১২ই ডিসেম্বর, বুধবার	১৩ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার	১৪ই ডিসেম্বর, শুক্রবার	১৫ই ডিসেম্বর, শনিবার	১৬ই ডিসেম্বর, রবিবার
সন্ধ্যা ৬.০০ মি **ন্যায় ধর্মের রামায়ণী পালা** প্রযোজনা: কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	সন্ধ্যা ৬.০০ মি **বাস্তুসাপ** প্রযোজনা: কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ	সন্ধ্যা ৬.০০ মি মুন্সি প্রেমচাঁদের **আখরি ইনাম** প্রযোজনা: দামামা, শিলিগুড়ি	সন্ধ্যা ৬.০০ মি **তিমির বিনাশী** প্রযোজনা: বালুরঘাট শপথ	সন্ধ্যা ৬.০০মি **সলিউশন্** প্রযোজনা: কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ
সন্ধ্যা ৭.১৫ মি **লৌহমানব** প্রযোজনা: অনীক, কলকাতা	সন্ধ্যা ৭.১৫ মি **স্বপ্ন স্নান** প্রযোজনা: আনন, সিউড়ি	সন্ধ্যা ৭.১৫ মি **মুক্তধারা** প্রযোজনা: সৃষ্টি মাইম, জলপাইগুড়ি	সন্ধ্যা ৭.১৫ মি **অতঃপর মাধো** প্রযোজনা: মেঠোপথ থিয়েটার, বাংলাদেশ	সন্ধ্যা ৭.১৫ মি **মিথ্যেবাদী** প্রযোজনা: শ্রুতি রঙ্গম, কলকাতা

১৫-১৬ ডিসেম্বর
নজরুল সদন
মাথাভাঙা

১৫ই ডিসেম্বর, শনিবার	১৬ই ডিসেম্বর, রবিবার	
সন্ধ্যা ৭.০০ মি **মিথ্যেবাদী** প্রযোজনা: শ্রুতি রঙ্গম, কলকাতা	সন্ধ্যা ৬.০০ মি **তিমির বিনাশী** প্রযোজনা: বালুরঘাট শপথ	সন্ধ্যা ৭.১৫ মি **অতঃপর মাধো** প্রযোজনা: মেঠোপথ থিয়েটার, বাংলাদেশ

আয়োজক:
আজাদ হিন্দ সংঘ
মাথাভাঙা

প্রচার সহযোগী এখন ডুয়ার্স

প্রবেশপত্র প্রাপ্তিস্থান Elite® FOOTWEAR
কোচবিহার শো-রুম

প্রথম পর্ব

ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং

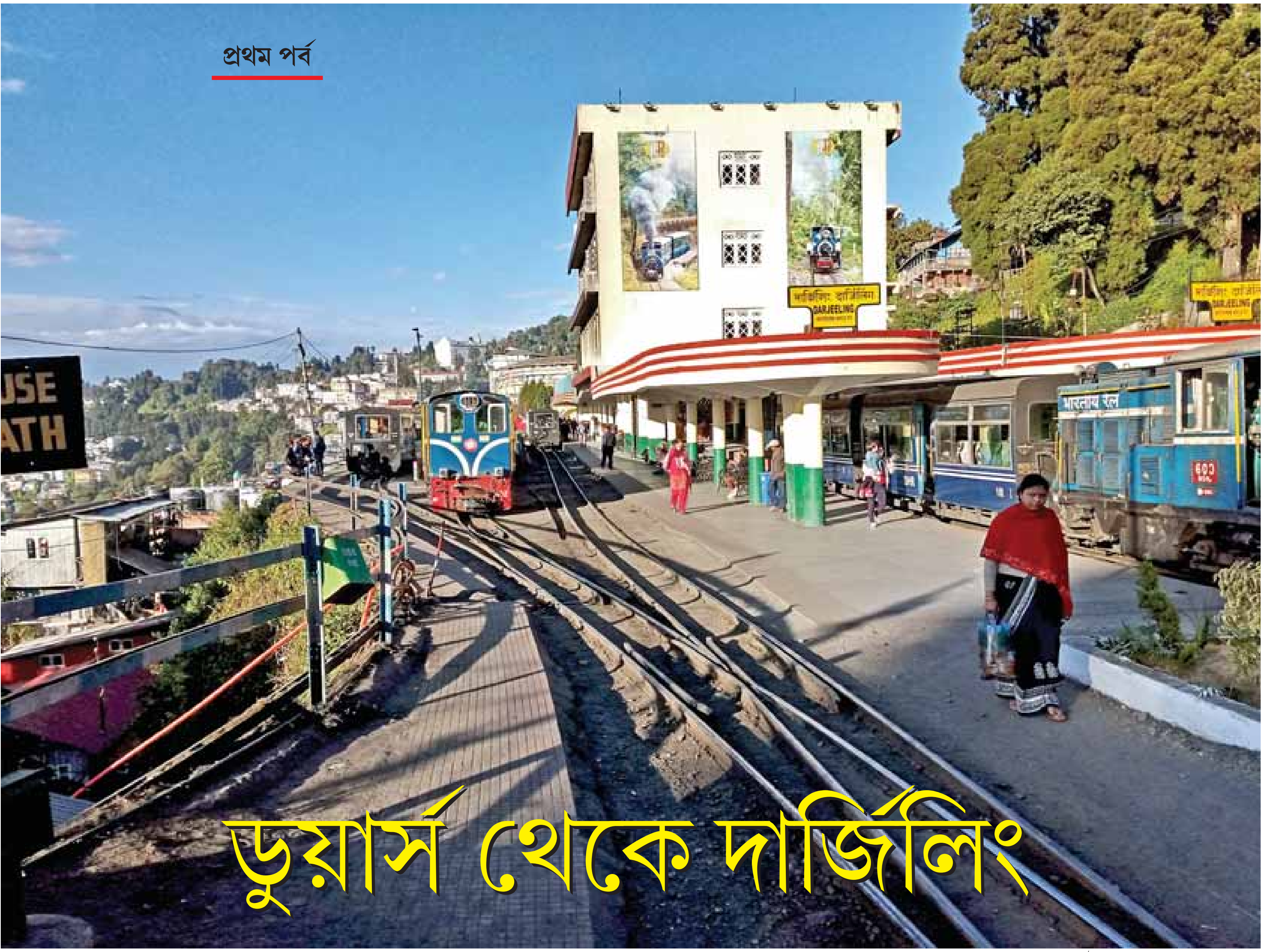

খেলনা ট্রেনের আড্ডা

হোটেলের দু-পাশ দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গেছে আর একটা গেছে উঠে। সামনেও দুটো রাস্তা। যেটা নেমে গেছে, সেটা চলে যাবে শহরের কেন্দ্রে। বাঁ দিক দিয়ে যেটা ওপরে উঠে একটা বড়ো গ্যারাজের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে, সেটা ধরে দু-মিনিট হাঁটলেই ম্যাল। দু-মিনিট লাগার কারণ গোড়ার রাস্তার দু-পাশে শীতবস্ত্রের বাজার। তা না হলে আশি সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা নয়। অক্টোবরের শেষ দিন। গোটা দার্জিলিং পাহাড় রৌদ্রকরোজ্জ্বল। মোবাইল অ্যাপ বলছে তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি। শিরশির করে হাওয়া বইছে। দুপুর দেড়টা। ব্যাগ-পরিবার হোটেল ঘরে জমা করে আমি ভাবছি ম্যালেই যাই।

ম্যাল যে আর আগের মত নেই, সেটা সবাই জানে। কিন্তু 'আগের মত থাকা'টা বাদ দিলে ম্যাল যে ম্যালেই থাকবে সেটা জানতাম। দু-পাশে দোকান বাদ দিলে

ম্যালে ঘোড়ায় চড়া, ছবি পূষণ দেব মল্লিক (রংরুট পত্রিকা থেকে নেওয়া)

আড্ডা চলছে, ছবি পূষণ দেব মল্লিক (রংরুট পত্রিকা থেকে নেওয়া)

সোয়েটার বাজারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা মেরে কেটে ফুট তিনেক চওড়া। পুজোর টুরিস্টদের বড় অংশ ফিরে গেছে। দার্জিলিং একটু ফাঁকা ফাঁকা। কিন্তু এ রাস্তায় পঞ্চাশ জন মানে বেশ ভিড়। গুটি গুটি পায়ে এর-তার পাশ দিয়ে, একে-তাকে সরিয়ে তিব্বতি কিউরিও শপের সামনের রেলিঙে হেলান দিয়ে একবুক শ্বাস নিয়ে তাকালাম ম্যালের দিকে। উত্তর দিকে পেল্লায় এক তিনদিক খোলা মঞ্চ। পেছনে অ-তি-কা-য় টিভি। পূব দিকে পর পর কাঠের বেঞ্চি পুরনো স্মৃতি বহন করছে। মঞ্চের দু-পাশ দিয়ে দুটো রাস্তার একটা চলে গেছে ভানুভবনের সামনে দিয়ে চিড়িয়াখানার দিকে। আরেকটা সেই বিখ্যাত রাস্তা— যার ডান দিকে খোলা পাহাড়ের হাতছানি। মহাকাল মন্দির।

কিন্তু সে পথেও বাজার। নিউ মহাকাল মার্কেট। ডান দিকটা দখল করে সার সার দোকান। মাথার ওপরে প্লাস্টিকের ছাউনি।

এই সব বাদ দিলে ম্যাল কিন্তু সেই ম্যালই। সওয়ারি খোঁজে ঘোড়া নিয়ে সহিসের আকুল চোখ। ভিনদেশি টুরিস্টদের চলাফেরা। অনেকটা বোঝা কাঁধে নিয়ে পাহাড়ি মেয়ের নিচু হয়ে হেঁটে যাওয়া। বেঞ্চির পেছনে একটা একটা চায়ের দোকান। দেশি টুরিস্টদের উচ্ছ্বাস আর সেলফি। শেষের ব্যাপারটা অবশ্য নতুন। কিন্তু যুগের হাওয়া গায়ে মেখে ম্যালের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বেশ মজা লাগল। ম্যালের মজা।

খানিকক্ষণ আগে যখন দার্জিলিং স্টেশনের উল্টোদিকে স্টিম ইঞ্জিনের বিশ্রাম নেওয়ার লাইন ঘেঁসে আমাদের গাড়ি জ্যামজটে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তখন প্রথম মনে হয়েছিল, বাঃ! দার্জিলিং তো বেশ সাফসুতরো দেখাচ্ছে। তারপর থেকে এই ম্যালে এসে অব্দি সেটাই

দু' নম্বর চা নেওয়ার পর গপ্পো জমে গেল। জানলাম, প্রশাসন খুব কড়া এখন। পথঘাট নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আর, হবে না-ই বা কেন? গুরুং-এর মাস্তানগুলো হয় জেলে নয় ফেরার। শুনতে শুনতে আমি আরেকবার চোখ দুটো প্যান করলাম ম্যাল জুড়ে। না। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কোথাও টাঙান নেই। কয়েকজন কিশোরকে দেখলাম রোলার স্কেট পায়ে এঁটে দক্ষিণের ঢাল গড়গড়িয়ে ছুটছে। ঘোড়ায় চড়ে পাক খেয়ে এলো দুটো বাচ্চা। তারপর কালো ঘোড়ায় এক মহিলা।

চোখে পড়ছে। পরিচ্ছন্ন দার্জিলিং! মাঝে দার্জিলিং ফেরৎ কাউকে জিগ্যেস করলে সে নাক কুঁচকে বলত, 'খুব নোংরা হয়ে গেছে দার্জিলিং! ময়লা টয়লা সাফ করার বালাই নেই। সব টাকা বিমল গুরুং খেয়ে ফেলছে।'

আমিও ভেবেছিলাম পথঘাট খুব অপরিচ্ছন্ন থাকবে। তাহলে বিনয় তামাং শক্ত হাতে হাল ধরেছেন?

একটা বেঞ্চের পেছনে গিয়ে তরুণী বিক্রেতার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে আমার হিন্দিতে বললাম, 'দার্জিলিং তো বহোত ক্লিন লাগতা হ্যায়!'

সে তাঁর বাঙলাতে বলল, 'ইখন একদোম ক্লিন।'

দু' নম্বর চা নেওয়ার পর গপ্পো জমে গেল। জানলাম, প্রশাসন খুব কড়া এখন। পথঘাট নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আর, হবে না-ই বা কেন? গুরুং-এর মাস্তানগুলো হয় জেলে নয় ফেরার। শুনতে শুনতে আমি আরেকবার চোখ দুটো প্যান করলাম ম্যাল জুড়ে। না। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কোথাও টাঙান নেই। কয়েকজন কিশোরকে দেখলাম রোলার স্কেট পায়ে এঁটে দক্ষিণের ঢাল গড়গড়িয়ে ছুটছে। ঘোড়ায় চড়ে পাক খেয়ে এলো দুটো বাচ্চা। তারপর কালো ঘোড়ায় এক মহিলা। ছেলে টুরিস্টরা ঘোড়ায় ওঠে কম। কেন, তা অনেক ভেবেও খুঁজে পাই নি। ম্যাল থেকে অশ্বারোহী হয়ে ভানুভবন অব্দি গিয়ে ফিরে আসার দক্ষিণা একশো টাকা।

দক্ষিণের মূল রাস্তার নাম নেহেরু রোড। দু-পাশে রকমারি দোকানপাট। হাঁটতে হাঁটতে বিখ্যাত দাস স্টুডিওর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। বাইরে পুরনো দার্জিলিং-এর ফোটোগ্রাফ বাঁধিয়ে রাখা। পছন্দ করে কেনা যায়। হোটেলের করিডোরেরও দেখেছি এই স্টুডিওর বেশ কিছু ফোটো ঝুলিয়ে রাখা।

পাহাড়ের রানির কাছে এসেছি। কোনও তাড়া নেই। গুটি গুটি পায়ে হোটেলে ফিরে এসে দ্বিপ্রাহরিক পেটপুজো সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম হাঁটাপথে। হোটেলের পাশ দিয়ে উঠে যাওয়া পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই আবার একটা চড়াই। সেটা জিমখানা ক্লাবের দিকে চলে গেছে। একদা যৌবনের দিনে দার্জিলিং-এর পথে যেটা টের পেতাম না, এবার পেলাম।

পাহাড়ি পথে পদচারণা, ছবি পূষণ দেব মল্লিক (রংরুট পত্রিকা থেকে নেওয়া)

হাঁফ ধরে যাচ্ছে। কাছেই কোনও একটা স্কুল ছুটি হয়েছে। নীল সোয়েটার আর ছাইরঙা স্কার্ট-ফুলপ্যান্ট পরা বালক-কিশোরীরা ফিরছে ঝাঁক ঝাঁকে। জীর্ণ জ্যাকেট পরা, বলিরেখাময় মুখে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ। নিচের রাস্তা তিনভাগে চলে গেছে তিন দিকে। হুস হাস করে দৌড়োচ্ছে গাড়ি। একটা সিঁড়ি পেয়ে আবার নিচে নামলাম। আরো একটু নিচে একটা বিরাট রিসর্ট। তার ওপর দিয়ে তাকালে শেষ বিকেলের ছায়া পড়ে থাকা পাহাড়ের গায়ে আরও খানিকটা দার্জিলিং।

সামনেই একটা ভিউ পয়েন্ট। অবশ্য ঝকঝকে আবহাওয়ার কারণে গোটা দার্জিলিংটাই ভিউ পয়েন্ট হয়ে গেছে। রাস্তা খানিকটা উঠে ভিউ পয়েন্টের পাশ দিয়ে আবার নেমে গিয়ে একটা বাঁক খেয়ে চলে গেছে। ডান দিকে প্রায় চুয়াত্তর একর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চিড়িয়াখানার একটা প্রান্ত। সিমেন্টে বাঁধান ভিউ পয়েন্টের মাথায় টিনের চাল। নিচে চরম রসভঙ্গের মত একটা হোটেল। একটু বসলাম। সূর্য বোধহয় অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওপারে সিকিমের দিকে নেমে আসছিল রহস্যময় ছায়া।

দার্জিলিং-এ প্রকাশ্যে ধূমপান বন্ধ। আসার পর থেকে কাউকে পথেঘাটে ধোঁয়া ওড়াতে দেখি নি। এবার নজরে পড়ল একটু নিচের একটা বাক্সমার্কা দোকানের আড়াল থেকে ধোঁয়া ছিটকে বেরুচ্ছে। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে দেখি চা-বিস্কুটের দোকান। ভেতরে এক রুক্ষচুলের তরুণী সিগারেট টানছে।

বললাম, চা মিলবে কি না। মিলবে। সিগারেট?

তরুণী এবার খুকরি মার্কা প্যাকেট থেকে একটা লম্বা সিগারেট এগিয়ে দিল। জিগ্যেস করলাম, 'আর কুছ নেহি?'

এবার দেশিয় সিগারেটের প্যাকেট বের হল। দেখলাম ছ-সাতটা আছে। সব ক-টাই চাইলাম। তারপর মৃদু স্বরে বললাম, 'লেকিন পিয়েগা কাঁহা?'

সে একটা তিন হাত লম্বা কাঠের বেঞ্চিতে বসেছিল। একটু সরে গিয়ে বলল, 'বইঠিয়ে।'

বসলাম। কিছুক্ষণ চু পচাপ। চা হল। কাগজের কাপে চুমুক দিয়ে তরুণীর দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আপ লে সকতে।'

সে এবার একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'নেহি নেহি!' তারপর লজ্জা মুখেই নিলো। তারপর জিগ্যেস করল, 'কলকাত্তাসে?'

'জলপাইগুড়ি।'

তরুণী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। 'আপ্পে! জলপাইগুড়ি!' জানা গেল, আমার শহরে সে একবার গেছে। ভানুনগরে তাঁর আত্মীয় থাকে। তাঁর বাবা দার্জিলিং-এ গাড়ি চালায়। টুরিস্ট নিয়ে ভোরবেলায় গেছিল টাইগার হিল। তারপর গেছে বাগডোগরায়। রাতে ফিরবে না। রাতে পাহাড়ের রাস্তায় গাড়ি চালান উচিত না। কত রকম ভূতপ্রেত থাকে, তার কি ঠিক আছে? চুড়েলরা তো সুন্দরী মহিলা সেজে লিফট চায়। তাঁকে এড়িয়ে যায় কার সাধ্যি? তারপর এক সময় পেছনে তাকালে ড্রাইভার দেখে মেয়েটা নেই! ব্যস! এরপর কমপক্ষে এক মাস তো খারাপ সময় যাবেই!

যখন ফিরে আসছি, আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। পাশের পাহাড়ে বাকি দার্জিলিং অজস্র আলোর বিন্দুতে ঝিকমিক করছে। হোটেল থেকে এই দোকান পর্যন্ত বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল ঢালু। এবার ফেরার পথে হাঁফাতে হাঁফাতে শামুকের গতিতে হাঁটতে লাগলাম। পাহাড় ঠান্ডা হচ্ছিল। কিন্তু আমি একটু ঘেমেও গেলাম। ছোট ছোট পথবাতি। গাড়ির আলো। এদিক ওদিক কমবয়সীদের জটলা। কাউকে মোবাইল খুলে ঝুঁকে থাকতে দেখছি না কেন? পকেট থেকে নিজেরটা বের করে দেখি নেটওয়ার্ক চমৎকার। কিন্তু ইন্টারনেট প্রায় অদৃশ্য। পরে টের পেয়েছিলাম, বিশেষ কিছু জায়গা বাদ দিলে দার্জিলিং-এ ইন্টারনেট পাওয়া খুব একটা সোজা নয়।

সাড়ে ছ-টা নাগাদ আবার ম্যালে ফিরে এসে দেখি জমজমাট কান্ড। পূবের খোলা দিক দিয়ে হু হু ঠান্ডা হাওয়া আসছে। রঙিন সোয়েটার জ্যাকেটে ঢাকা কয়েক শো নারীপুরুষ। বিশালাকৃতির টিভিতে চলছে ফুটবল ম্যাচ। বেঞ্চিগুলো ভর্তি। অক্সফোর্ড বুক স্টলের পাশে কয়েকটা ছোকরা গান গাইছিল। তাঁদের ঘিরে জনা পঞ্চাশেক লোক মোবাইল উঁচিয়ে দন্ডায়মান। ম্যালে খুব বেশি আলো লাগিয়ে ঝলমলে ভাব আনার চেষ্টা হয় নি। আনলে খুব খারাপ হত। আলো-আঁধারির রহস্যটা হয়ে যেত নষ্ট।

নেহেরু রোডে বেশ ভিড়। খোলা মঞ্চের চাতালে বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে সেই রাস্তা ধরে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। দাস স্টুডিও পেরিয়ে বিশ্ব বাংলা-র বড়ো দোকান দেখেছিলাম দুপুরে। সেখানে একবার ঢুঁ মারতে হবে। আপাততঃ এটিএম মেশিনের খোঁজে।

ফিরছি যখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। এখন ডান দিকে ওপরে নেহেরু রোড। বাঁ দিকের পাহাড় আলোয় সাজান। আমার পথ প্রায় জনহীন। আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে উঠছি আর হাঁফাচ্ছি। অ্যাপ বলছে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি। কিন্তু বাতাসে কনকনে ভাবটা নেই। হঠাৎ আলো চলে গেল। ঝপ করে অন্ধকারের পর্দা এসে পড়ল শহরের ওপর। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বড়জোর আধ মিনিট। আবার ফিরে এল আলো। যে ক-দিন ছিলাম, রাতের ওই একবারই পাওয়ার কাট পেয়েছি। দিনের বেলা যতক্ষণ হোটেলে ছিলাম, বিদ্যুৎ ছিল। বাকি সময়টা বলতে পারব না।

কিন্তু আধ মিনিটের অন্ধকার, হুস হুস হাওয়া, ঝকঝকে আকাশ আর অল্প অল্প কুয়াশায় মনে হচ্ছিল, রাতের পাহাড় চলাচল না করাই ভালো। চুড়েল লিফট চাইতে পারে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

রাজীবের অসুস্থতা সম্রাজ্ঞীকে নিষ্প্রভ করে। মনখারাপের দেশে নিয়ে যায়। কোচবিহারের আদ্যপান্ত ইতিহাস, ব্রাহ্মধর্ম, সুনীতিদেবীর আত্মজীবনী হাতে ধরে পাঠ, নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর একসূত্রে কাজ করা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করে শিক্ষার বাতাবরণ, বিশেষ করে নারী শিক্ষার উৎস সন্ধানে কত কাজ করেছেন মহারাণী সেসব বিষয়গত বইপত্র বাইরে থেকে আসা অধ্যাপকেরা খুব উৎসাহ নিয়ে সম্রাজ্ঞীর কাছে শুনেছে। কিছু বই সংগ্রহ করেছে। চলছে সেমিনারের প্রস্তুতি।

—তুই খাবি?

—হুম দাও।

খুব কষ্ট বুকের ভিতর। সামনে শূন্যতা ভীড় করে আসে চোখে। আর দুবছর চাকরি আছে রাজীব মিত্রের। তার মধ্যেই নিশ্চয়ই রাণীকে মানে সম্রাজ্ঞীকে দাঁড়াতে হবেই। মনে মনে সে ভিতরের প্রতিজ্ঞাটুকু বাক্সবন্দী করে। আবার চোখে সেই ছায়া। সাদা পোশাকের ঝকঝকে হীরের মুকুটের মহারানী সুনীতি দেবী। যাঁর জীবনে বাবা মায়ের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রখর। বাবার কর্তব্যপরায়ণতা, ধর্মপ্রবণতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, উদার আর আধুনিক সংস্কৃতিমনস্ক গুণগুলি সুনীতির ব্যক্তিত্বে শক্তির সঞ্চার করেছিল। আর মা'র কাছে পেয়েছিলেন সাহিত্য রচনার প্রেরণা, দয়া, সহানুভূতি, অন্যের দুঃখে প্রাণ কেঁদে ওঠার মহান গুণগুলি। সেই তাঁকেও তো ছেড়ে আসতে হয়েছিল সেই পিতৃ মাতৃ গন্ডীর উদারতা, বোনেদের সান্নিধ্য, যদিও বোনেদের একজন সাবিত্রীদেবী পরে রাজপরিবারেরই কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী হয়েছিলেন।

রাণীর মন বিষন্ন। বাবার দরজায় দাঁড়ায় এসে শুকনো মুখে। ডাক্তার কাকা বহুক্ষণ চলে গেছেন। শুধু এ স্যালাইন শেষ হলে কিভাবে খুলে দিতে হবে শ্যামলকে

জানিয়ে চলে গেছেন। রাণীর মাথায় পরম স্নেহের হাত রেখেছেন, শুধু বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই মা। আশ্বস্ত বুকের ভেতর তবু কিসের ওড়াউড়ি। বাবা চোখে চোখ দিয়ে কাছে ডাকেন। রাণী ধীর পায়ে রাজীবের বিছানার পাশে চুপ করে বসে থাকে। আজ কোনও কাজ নয়, কোনও ভাবনা নয়,শুধু বাবার হাত ধরে অনন্তকাল বসে থাকা।

তবু এই প্রিয়জনের অসুস্থতা রাণীর মনের ভিতর কেমন ধাক্কা দেয়। কিছুতে কাছে আসতে পারে না। মার পা ভেঙেছিল যখন ঠিক তখনও বিছানার পাশে এসে ছুঁয়ে দিতে কেমন ভয় ভয় হত। আজও তেমনই হচ্ছে। সহজ হতে পারছে না বাবার কাছে বসে। শুধু ভাবছে ওকেও সব ছেড়ে কোনওদিন যেতেই হবে নাকি! কী করে যাবে ও! সঙ্গে সঙ্গে মনে কার ছায়া স্ফটিকের মত, তার তো সাদা পোশাক। মাথায় পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সম্ভবত কোরাস্থিয়াম আঙ্গিকের শিরস্ত্রাণ। আহা! তাকেও নৃপেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষা শেষে কোচবিহারের মহারাণী হয়ে, এক ছোট রাজ্যের কর্ত্রী হয়ে আসতে হয়েছিল। কীভাবে আপন করে নিয়েছিলেন তিনি, কীভাবে রাজবাড়ির সংস্কারগুলো বদলে গেল ধীরে অতি ধীরে, কিন্তু দৃপ্ত ভঙ্গীতে, দৃঢ়ভাবে। বাবা মায়ের প্রভাব সুনীতির উপর কী দারুণ ভাবে এসেছিল পরবর্তী কাজই সে চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত। তাঁর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল অলক্ষ্যেই। সাহিত্য রচনার প্রেরণা, দয়া-সহানুভূতি, পরদুখকাতরতা, সব মানবিক গুণগুলোর সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর। এ রাজ্যের এই পৃথক আধুনিকীকরণ প্রয়াসে নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে যে শক্তি কাজ করেছে তা মহারাণী সুনীতিদেবীর শক্তি।

* * *

একটু কি ঝিমুনি এসেছিল রাণীর! বিছানায় ততক্ষণে উঠে বসেছেন রাজীব। ওর বুকের কাছেই মাথা রেখে দুচোখ বুজে এসেছিল রাণীর। এ ঘুমের ভিতর সবটুকু ক্লান্তি ভোলার মন্ত্র আছে। বাবার স্পর্শই রাণী ওরফে সম্রাজ্ঞীকে জাগিয়ে দেয় বার বার। ঘুমের ভিতর রাজীবের ছোঁয়া কী যে শান্তি এনে দিচ্ছিল বার বার, মাথা না উঠিয়ে রাজীবের পাশেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে সম্রাজ্ঞী।

ছায়া এসে পড়ে রাতের জানলা দিয়ে, দরজার পর্দার পাশ থেকে। রাজীবের দুর্বল শরীর কন্যার স্পর্শে যেন জেগে উঠছিল, সোহাগিনী বহু কাজের পর বিরতিতে রাতের আবছায়া নিয়ে রাজীবের সাদা চাদরের পাশে এসে বসেছিল নীরব নিশ্চুপ। রাজীবের চোখের সামনে কোটি কোটি পতঙ্গ হেঁটে যায়, আর এঁরা কারা পরপর... মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিশ্বকবির বিরাট শরীর আর লম্বা জোব্বা, ...একে একে রমেশ চন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, অসিত হালদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গুরুসদয় দত্ত, পন্ডিতা রমাবাঈ, মনীন্দ্র নাথ নন্দী, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সৈয়দ আমীর আলী, বিপিনচন্দ্র পাল, শরৎকুমারী চৌধুরানী, লীলাবতী মিত্র, কামিনী রায়, কমলা বসু, সৌদামিনী ধর, সরলা দেবী চৌধুরানী, লেডি অবলা বসু কাকে ছেড়ে কার নাম নেবে... ছায়া ছায়া অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ পরিষ্কার তাঁদের ছবি, যাঁদের সঙ্গে এ রাজবাড়ি, মহারানী সুনীতিদেবীর সংস্পর্শ ছিল। গড়ে উঠেছিল অনেকের সঙ্গেই নিবিড় সম্পর্ক আত্মীয়তা।

রাজীব ওর এই স্বপ্নছবিগুলো পর পর যেমন দেখেন, তাঁর কন্যাটিও হয়েছে ঠিক তেমনই। ছোটবেলায় গল্প শুনে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা মেয়ে কত বড় হল, ভাবতে ভাবতেই কয়েকবার নিজের শরীরের ভাবনায় খানিকটা শিহরণ জাগে, এক শূন্যতায় ঘিরল তাকে।

ঘরের তিন মনীষীর ছবির পাশে মহারাজা আর মহারাণীর সাদা পোষাকের ছবিটার দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকেন। আর সোহাগিনীর সঙ্গে সুনীতি দেবীর স্কুল প্রতিষ্ঠা আর তার মায়ের ফিটন চেপে স্কুলে যাওয়ার গল্পও বাদ যায় না। শোনা গল্পগুলোও কেমন সত্যি হয়ে যায়। সোহাগিনীওতো সেই বিখ্যাত মেয়েদের স্কুলেই পড়েছে, সময় শুধু বদলে বদলে যায়। শাশুড়ি মায়ের সময়টা ছিল স্কুল প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রথমদিকের

এই প্রিয়জনের অসুস্থতা রাণীর মনের ভিতর কেমন ধাক্কা দেয়। কিছুতে কাছে আসতে পারে না। মার পা ভেঙেছিল যখন ঠিক তখনও বিছানার পাশে এসে ছুঁয়ে দিতে কেমন ভয় ভয় হত। আজও তেমনই হচ্ছে। সহজ হতে পারছে না বাবার কাছে বসে। শুধু ভাবছে ওকেও সব ছেড়ে কোনওদিন যেতেই হবে নাকি! কী করে যাবে ও! সঙ্গে সঙ্গে মনে কার ছায়া স্ফটিকের মত, তার তো সাদা পোশাক। মাথায় পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সম্ভবত কোরাস্থিয়াম আঙ্গিকের শিরস্ত্রাণ।

কথা। সোহাগিনীর সময় ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেকটাই। শুরুর সময়ের দশজন আর নয়। রাজীব জানে সে সময়কার ইতিহাসের পৃষ্ঠা ঘেঁটে কত কাজই না করছে গবেষক, অধ্যাপক আর উৎসাহী সাধারণ মানুষেরা।

মহারানী সুনীতিদেবী কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন যশস্বী সব শিক্ষক শিক্ষিকাকে। শুধু তো সুনীতি কলেজই নয়, একই সঙ্গে ভিক্টোরিয়া কলেজ, জেঙ্কিন্স স্কুল সব কটিরই উন্নয়ন প্রকল্প ছিল উচ্চমার্গের। সাহেব, মেমসাহেবের বিস্তর অবদান ছিল এই শিক্ষা পরিকল্পনায়।

মায়ের গল্পগুলোতো তারও চোখে ছবি। ছাত্রীদের রেজাল্ট বেরোবে, সেদিন সুন্দর পোষাকে মহারাণী সুনীতিদেবী নিজে উপস্থিত থাকতেন। ছাত্রীরা যারা খুব ভাল ফল করেছে তাদের নিজে হাতে পুরস্কৃত করতেন, এমন কি প্রথম স্থান পাওয়া ছাত্রীরা মহারাণী হাতে সোনার গহনাও উপহার পেয়েছেন। এমন উদ্যমী মানুষের ছায়া ঘুরে বেড়ায় কোচবিহারের রাস্তাঘাটে, শিক্ষাব্রতী গবেষক মানুষদের মন জুড়ে। তিনি হারিয়ে যাবেন কী করে! এইতো সেদিনই রাণী জিজ্ঞেস করছিল, 'আচ্ছা বাবা, ওই যে একখানা লাল ইটের বাড়ীতে গান শেখানো চলে, তার পাশে ওই যে অন্ধকার শ্যাওলা ধরে যাওয়া ইটের ছোট প্রাসাদের মত ঘর, ওটা কীসের বাবা? রাজীব খানিকটা ভাবেন, ও আচ্ছা, তুমি ওই কেশব রোডের পড়ে থাকা বাড়িটার কথা বলছ? ওটা মহারাণীর সময় আর তারপরেও রমরমিয়ে চলত রে। মহারাণী ওখানে ব্রাহ্ম সমাজের সভা বসাতেন,উপাসনা হত অবিরাম। বহু ব্রাহ্ম তখন, কোচবিহার রাজবাড়ি শুধু নয়, এখানকার অভিজাত পরিবারের অনেকেই কেশবচন্দ্র সেনের দেখানো পথে সুনীতিদেবীর অনুপ্রেরণায় সমাজে যোগ দিতেন। সঙ্গীত বেজে উঠত। কত মেয়েরা সেখানে যেতেন। ধীরে ধীরে এখন তা স্তব্ধ। তবু যেন কান পাতলে প্রতি ইটে শোনা যায় সুর, ব্রহ্ম উপাসনার সুর।

কেশব চন্দ্র সেনের সাহচর্য, অভিজ্ঞ শিক্ষায় সুনীতির জীবনের পরিপূর্ণ শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল বলেই নানা উদ্যোগ তিনি নিজস্ব সিদ্ধান্তে স্থির অবিচল ও দৃঢ় ভাবে নিতে পারতেন। মহারাণীর এ কাজ তো আর গল্প কথা নয়। তাই সম্রাজ্ঞীর চারিত্রিক গঠনে এ চরিত্রের অবদান রাজীব সবসময় তুলে ধরেছেন, এখনও শুনতে চায় রাণী বার বার। রাজীবের বড়দাদা দীপক রাজবাড়ির অন্দরমহলে ছোটদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। ওনার কাছেও সে অন্তপুরের কাহিনী প্রচুর শুনেছে। বড় বড় আসবাবপত্র, ঘরের সৌন্দর্য রক্ষা সবটাই রাণীর প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপে ও নির্দেশে হত আর সুষ্ঠুভাবে সকলে নিয়মমত সময়ের কাজগুলো সম্পন্ন করত। অন্তপুরে ভৃত্যের সংখ্যা, পরিচারিকা, পাচকপাচিকা থাকলেও সুনীতিদেবী নিজে হাতেও সে কাজ সম্পন্ন করতে ভালোবাসতেন। যে মানুষদের নাম অসুস্থ দুর্বল রাজীবের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সুনীতিদেবীর জীবনী হাতে নিলেই, তাঁদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে আছে বলে রাজীব মনে মনে গর্বিত হয়, প্রথম যেদিন এ তথ্য জেনেছিল ছোট্ট সম্রাজ্ঞী, উত্তেজিত রোমাঞ্চিত হয়ে বাবার কাছে সে গল্প শুনে নিয়েছিল, কোথায় গেল তার স্নান খাওয়ার সময়, কোথায়ই বা কলেজ, সেদিন এগারটার ক্লাসটায় গেলই না রাণী।

কবিগুরুর সঙ্গে যে সুনীতি দেবীর পরিবারেরই মধুর সম্পর্ক ছিল, পরে তা আত্মীয়তার বন্ধনে দৃঢ়তা পায়। তবে রাজীবের ভাবতে অবাক লাগে, কবিগুরু কতবার উত্তরের পাহাড়ী এলাকায় এসেছেন, অবশ্য জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আরও বিশেষভাবে টান অনুভব করেছেন, দার্জিলিং, মংপু, কার্শিয়াং, কালিম্পং-এ থেকেছেন বেশ কিছুদিন করে, কিন্তু কোচবিহারে তিনি আসেন নি, সে ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেও পাওয়া যায় না। অথচ সেখানকার মহারাণীর সঙ্গে কবিগুরুর তৈরি হয়েছিল আত্মিক সম্পর্ক।

* * *

হঠাৎই রাজীব সোহাগিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন,'আচ্ছা, তোমার ওই গানটা মনে আছে? আগে প্রায়ই গুন গুন করতে, করো না একবার

"...মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি
বিস্ময়ে..."

বাব্বা...মেয়েটা একটু শুয়েছে। এখন থাক। এবার রাজীবই সুর ধরেন, কী এক সুস্থতার দীপ্তি

এ গানের প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে আর সুরের অনুরণনে ভেসে ভেসে যাচ্ছে যেন। দারুণ প্রশান্তিতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকায় সম্রাজ্ঞী। বাবার গলায় সুর এতদিন পর, আহা! ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। চোখ বন্ধ রাজীবের শরীরে মাথা রেখে সেও গায়... আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে...

১০

ওঁ পিতা নোহি নো বোধি
মা মা হিংসী বিস্যানি দেব...

ব্রহ্ম উপাসনা। প্রতিদিন, স্থাপনকাল ১৮৮১ থেকে আজও পর্যন্ত এ মন্ত্র ছাত্রীদের শরীরে জন্মদাগের মত। ওরা সুর করে তারপরই 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি...' অথবা, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে... গেয়ে ওঠে দিন বিশেষে। চলতে চলতে কতগুলো যুগ পেরিয়ে যায়। সম্রাজ্ঞী মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে একলাটি থাকতে থাকতেই খুঁজে পায় বন্ধুদের। আজ স্কুলের মাঠটাই ভীষণ মনে পড়ছে। স্পোর্টসের দিন সাদা থাক থাক ফ্রক আর সাদা মোজা কেডসে দেখাতো যেন পরীটি। হাতে থাকবে একটি করে কাঠির মাথায় লাগানো স্টার। হয় "বল বল বল সবে", নয়তো "চল চল চল উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল..."

হুম মাদলই বটে। স্কুল শুরুর সময়টা একান্ত নিষ্ঠায় দুষ্টু মেয়েগুলোও কেমন শান্ত। আসলে সুনীতি দেবী মহারাণীতো, এমনি করেই ছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

সম্রাজ্ঞীর হাতে শতবর্ষের পুরনো এক পত্রিকা সুনীতি একাডেমীর। ওখানে সেই সময়ের নামী কবি কবিতা সিংহের একখানা কবিতা পেয়ে গেলে জোরে জোরে সরব পাঠের ইচ্ছে জাগে ওর। কবিতা সিংহের কবিতা-— প্রণাম

যে প্রণাম শিখা হয়ে জ্বলে
জ্বালে দীপ থেকে দীপ
যে প্রণাম ক্রমে ক্রমাগত
তাহারই বিনয়ে মন-
হয়ে থাক চির অবনত।

প্রণাম বিদ্যার দান/বিদ্যা মানে বিচ্ছুরিত জ্যোতি/আলোর সরণি বেয়ে/উঠে যাক প্রাণের আরতি

সত্যিই সম্রাজ্ঞীরও ইচ্ছে হয় এমন মানুষকে নিয়ে লিখবে। ঠিক এইজন্যই সব ছড়িয়ে বসে আছে। এক্স হেডমাষ্টারমশায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটা বার বার পড়তে ইচ্ছে করে, আর প্রাক্তনী কলমের জোরদার গদ্যকথা জ্যোতিরিন্দু দেবী মজুমদারের লেখাটা ভারি টানে। তাঁর ঘষা কাচের প্রান্ত থেকে দেখা অতীত যেমন টানে, তেমনি in April 1917 my wife (SM. Muktamala Chaterjee) and I joined the service of the Academy... ওই My service at the SUNITY Academy, প্রবন্ধের লাইনগুলো পড়লেই সম্রাজ্ঞীর চোখের সামনে খেলা করে হুড খোলা এক অদ্ভুত জিপে মুক্তামালা চ্যাটার্জি আর তাঁর স্বামী নগেন্দ্রনাথ আরামে চোখ বুজে আছে। শ্রদ্ধায় নত হয় তাঁদের মন। বিশেষ রকমে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন তাঁরা।রাজবাড়ী তরফে পাঠানো হয়েছে গাড়ী,আপ্যায়ণের ত্রুটিও রাখা হয়নি।কর্তা যোগ দিলেন হেড পোষ্টে আর স্ত্রী সহ শিক্ষিকা পদে ১৯১৭সালে।

কী অদ্ভুত ভাবে মহারাণীর হস্তক্ষেপে তাঁর বিদগ্ধতায় 'রতিবাবুর স্কুল' নামে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেই স্কুলই ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত সুনীতি কলেজ নামে। প্রথমদিকে সুনীতিদেবীই আর্থিক সহায়তা করতেন, পরে১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উদ্যোগে সুনীতি কলেজের নতুন নাম হয় সুনীতি একাডেমী।

নগেন্দ্রনাথের ইংরেজি প্রবন্ধখানা রাজীব মিত্রকেও বড় টানে। তিনিও হলদে হয়ে আসা এ বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে মাঝে মধ্যে কী যেন খোঁজেন। আদ্যপান্ত পড়েন, নারী শিক্ষার একেবারে জন্মলগ্ন থেকে এ বিদ্যালয়কে ছুঁয়ে থেকে যেন রাজীব তাঁর মাকেই খোঁজেন। সে অনুভূতির খানিকটা উজার করে সোহাগিনী, সম্রাজ্ঞীকেও তো দিতে পেরেছেন তিনি।

কেউ মৃত্যুবরণ করছেন, শোক উজার করে দেখাতে হবে, লোক নেই, তাই কান্নার লোক চাই। নিকটজনেদের চোখের জল একসময় ফুরিয়ে যায়, রাজকীয় প্রথায় ছিল বেতনধারী রুদালি। তারা সেই মৃতব্যক্তির শব ঘিরে পরিবারের সৌজন্যে কাঁদবে। কী ঘৃণ্য প্রথা! আর যারা অভাবে পড়ে এ প্রথায় জড়িত ছিল তাদের অসহায়তার কথা ভেবেও উদাস সম্রাজ্ঞী। মনে পড়ে রাজস্থানে এক গ্রামে এখনও ওই ধরণের রুদালি প্রচলিত। সে কাহিনী নিয়ে ডিম্পল কাপাডিয়া অভিনীত এক ছবিও দেখেছিল। সিনেমাটা চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সম্রাজ্ঞীও কোচবিহারের মহারাণী, নারী শিক্ষার আলো যিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে তথ্য খুঁজতে খুঁজতে 'দি এমপ্রেস'পত্রিকা থেকে জানতে পারে রাজবাড়িতে এক সময় রুদালি প্রথা ছিল। ভারি অদ্ভুত লেগেছে এ ব্যাপার। কী অমানবিক আর নিষ্ঠুর, আর কারুণ্য ভরা ইতিহাস। কেউ মৃত্যুবরণ করছেন, শোক উজার করে দেখাতে হবে, লোক নেই, তাই কান্নার লোক চাই। নিকটজনেদের চোখের জল একসময় ফুরিয়ে যায়, রাজকীয় প্রথায় ছিল বেতনধারী রুদালি। তারা সেই মৃতব্যক্তির শব ঘিরে পরিবারের সৌজন্যে কাঁদবে। কী ঘৃণ্য প্রথা! আর যারা অভাবে পড়ে এ প্রথায় জড়িত ছিল তাদের অসহায়তার কথা ভেবেও উদাস সম্রাজ্ঞী। মনে পড়ে রাজস্থানে এক গ্রামে এখনও ওই ধরণের রুদালি প্রচলিত। সে কাহিনী নিয়ে ডিম্পল কাপাডিয়া অভিনীত এক ছবিও দেখেছিল। সিনেমাটা চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী অদ্ভুত মনের জোর মহারাণীর দৃপ্ত দৃঢ়তায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন এ রুদালি প্রথা। সাবলীল ভাবে পারেন নি, বাধা এসেছিল রাজ পরিবার থেকেই। কিন্তু শক্ত হাত বাড়িয়ে থামিয়েছিলেন এ প্রহসন।

* * *

বাবার অসুস্থতায় ক'দিন কলেজ যায়নি রাণী। পোষাকি সম্রাজ্ঞীর খোঁজে বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছিল বন্ধুরা। কাল সন্ধেটা বড় ভাল কেটেছে। তোর্সা বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটছিল ওরা সকলে। অরুণের নামটা সম্রাজ্ঞীর সামনে খুব সচেতন ভাবেই বন্ধুরা উচ্চারণও করে না। সম্রাজ্ঞী জানে, সূক্ষ্ম একটু বিষাদ বুকের ভিতর কাঁটার মত খুঁচিয়ে যায়। তবে এবছর আর সে ভাবনা নেই। অরুণ পাস আউট এ বছর। মাঝে মাঝে কলেজটাকে কেমন রুক্ষ শূন্যও তো মনে হয়। একথা কেউ জানে না। এইসব একত্র চলা, সংগঠিত হওয়া বা যে কোনও গুচ্ছের প্রতিবাদে তো অরুণের কথা, মুখ, আশরীর উপস্থিতি সকলকেই নাড়া দেয়। মুখে না হোক, বুকে উঠে আসে নাম। অস্ত সূর্যের উল্টোধারে ওরা দাঁড়িয়ে আছে এখন।এবারে সুনীতি দেবীর জন্মদিনটা সম্রাজ্ঞী, পর্না, তৃপ্তি, সোহিনী ওরা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পালন করবে বলে ঠিক করেছে, সঙ্গে নিয়েছে শুভানুধ্যায়ী যারা। কলেজেরই এক ক্লাসঘরে ওরা নৃপেন্দ্র নরায়ণ, সুনীতিদেবীর উপর মূলত কোচবিহার বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করবে। আগামীকাল তার মিটিং। সে কথা বলতেই সব হৈ হৈ করে ওঠে সম্রাজ্ঞীর বাড়ীতে।

রাজীবের শরীর দুর্বল থাকলেও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে পড়েন ঠিক ওদের মতই। বাইরের ঘরের কাঠের আলমারি বোঝাই নানা পত্র পত্রিকা পুরনো বই। ফুটো ফুটো করে দেওয়া, পোকায় কাটা কোচবিহারের ইতিহাস, ক্যাম্বেলের চোখে উত্তর, কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রীর বই, বিশ্বনাথ দাসের অটোবায়োগ্রফি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস— বইগুলো খুঁজে খুঁজে বের করেন। কারণ, সেমিনার হ'লে সম্রাজ্ঞীকেও তো বলতে হবে কিছু। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী বলে কথা। এই শেষ বছরটা ভাল কাটুক, মেয়েটাকে আসলে রাণীর মতই পূর্ণা, আর কাজের মত করেই বড় করতে চেয়েছেন। বন্ধুরা সব সন্ধের পর পর বেরিয়ে গেছে। সম্রাজ্ঞী পড়ছে। ওর এই পড়ার সময় রাজীবের বারান্দায় নিশব্দ পদচারণ এটা একটু বড় হ ওয়ার পর থেকেই দেখছে রাণী। ছোটবেলায় তো একটু কাছে বসতে হত। লেখা, বিষয় সব বলে দেওয়ার জন্য। এখন দূর থেকে দেখা, এটাইতো বোধহয় ঠিক পদ্ধতি। নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার বদলে সোহাগিনীকেও মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে দুজন মিলে ওর কাজকর্ম খেয়াল করেন। সোহাগিনী কপট রাগে সরে যেতে যেতে বলে যান, 'দেখো না তো! বাবা, মাকে দেখতে নেই। যা দেখবে যা বলবে বাইরের মানুষেরা...'

* * *

দুপুরের খাওয়ার সময় কেমন অন্যমনস্ক দেখায় রাণীকে। সোহাগিনী বার বার এটা সেটা পাতে তুলে দিলেও খুঁটে খুঁটে একটু খেয়েই উঠে পড়ে। সোহাগিনী পিছন থেকে একটানা বলেই যান, কিছুইতো খেলি না, একী!

হাত নাড়ে রাণী —দাঁড়াওতো! এসে খাব।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

স্কেচ দেবাশিস সাহা

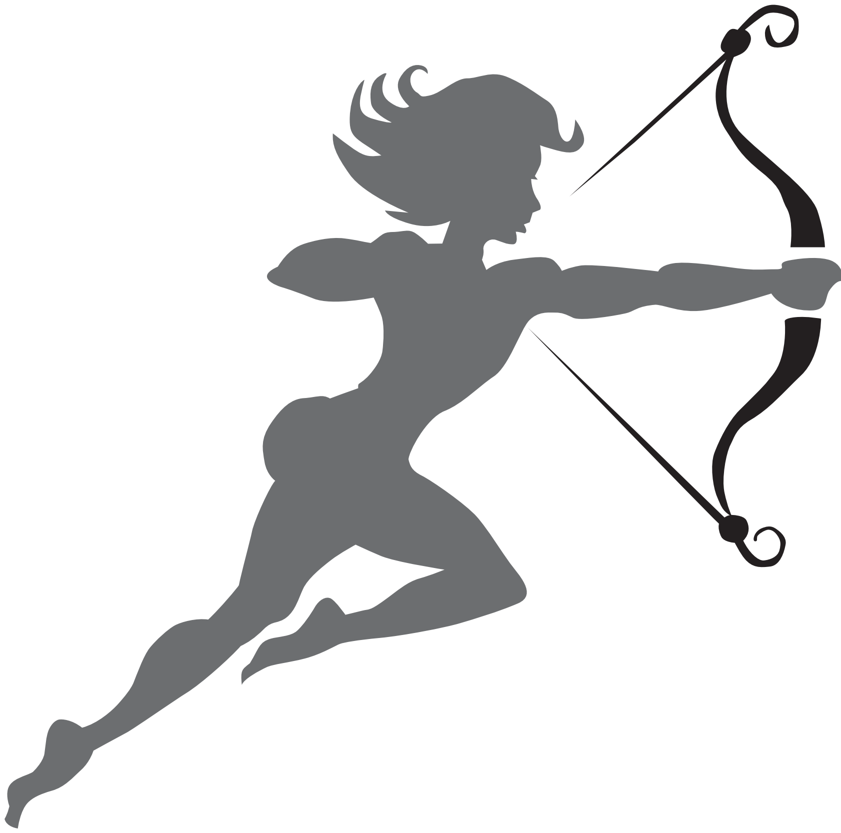

ধারাবাহিক কাহিনি

অরণ্য মিত্র

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

রিয়াকে চমকে দেবে বলে রবির খবর যোগাড়ে ত্রুটি রাখছেন না সন্দীপ জানা। রবির নাকি অনেক মেয়েঘটিত ব্যাপার ছিল। কিন্তু রিয়া সে সব হেসে উড়িয়ে দেয়। নন্দন বর্মাকে নিয়ে রবির বাড়িতে কিছু টাকা পৌঁছে দেবার কথা ভেবেছিলেন রাধু বর্মন। মনোজের কাছ থেকে নন্দন বর্মা জেনেছেন রবি হত্যার কেসে পুলিশ এখনো অন্ধকারেই। তাঁর মোবাইল লোকেশন শেষ যেখানে পাওয়া গেছে, সেটা শিঙ্গিহাটা। রবি সেখানে গিয়েছিল কেন? তাঁর ফোনে সে বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। ওদিকে পরেশ প্রামাণিক আবার জামাই হিসেবে পছন্দ করছেন সন্দীপ জানাকে। রিয়ার সঙ্গে গল্প করে নন্দন বর্মা অনুমান করলেন, রবির হাতে কিছু টাকা এসেছিল। কে দিল? নন্দন বর্মা কি কিছু টের পাচ্ছেন এই বিচিত্র হত্যাকান্ডের ব্যাপারে? জানা যাবে এই পর্বে।

১৩

রবির কাকার বাড়ি মাথাভাঙ্গা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। রাজ্য সড়ক থেকে কিলোমিটার খানেক ভেতরে যেতে হল। কাঁচা রাস্তা। শুকনো সময় বলে গাড়ি নিয়ে যেতে সমস্যা হল না। বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নন্দন বর্মা মৃদু গলায় মন্তব্য করলেন, 'অবস্থাপন্ন গেরস্ত।'

সামনের দিকে পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ঘেরা বেশ বড় উঠোন। তার পরে কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। একটা পাকা। বাকিগুলো টিনের। পাশের খেতে বেগুন ধরেছে। উঠোনে গেঞ্জি পরা একজন নিরীহ বুড়োটে লোক দাঁ চালিয়ে বাঁশের একটা টুকরোকে মসৃণ করছিলেন। তিনি বিস্মিত চোখে তাকালেন।

'সহদেববাবুর বাড়ি?'

লোকটি শুকনো গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। আমিই।'

'নমস্কার। রবি আপনার ভাস্তা হয়? আপনি রবির কাকা?'

'আপনার কে?'

'ইনি আমার বন্ধু রাধু বর্মন। রবি এর দোকানে কাজ করত। সে শেষ তিনমাস মাইনে তোলেনি। সেই টাকাটা আর সঙ্গে আরও কিছু টাকা দেব বলে এসেছি। ভয়ের কিছু নেই।'

লোকটি হাঁফ ছেড়ে সহজ হয়ে বললেন, 'আসেন আসেন। রবি আমার দাদার ছেলে আসিল। বাচ্চা বয়সে বাপ-মা মরসে। আমার কাসেই বড়ো হৈল। তা, টাকা আর কারে দিবেন। অর তো নাই কেউ। অঁয়, অঁয় দেকতেসেন ঘরখান? রবির ভাগের। নরু বক্সির কাসে বন্দক রাকসে।'

'কবে?'

'সে অনেক দিন।'

লোকটা হাঁকডাক দিয়ে ভেতর থেকে দুটো প্লাস্টিকের সবুজ চেয়ার, একটা টুল, একটা থালায় পান-সুপুরি আর বিড়ির প্যাকেট আনিয়ে ফেললেন কয়েক মিনিটের মধ্যে।

'সা খাবেন না?' তারপর বললেন। 'রবির ওয়ারিস কন যদি তো মুই-ই আসু।'

'জমি বন্দকের ব্যাপারটা কী বলছিলেন? আসন গ্রহণ করলেন নন্দন বর্মা। রাধু বর্মন চুপ। মনে হয় না এ যাত্রায় তিনি কিছু বলবেন। রবির কাকা একটু কেশে বললেন, 'মাধ্যমিকে ফেল মারল। তখন অর মাথায় ঢুকলো মোবাইলের কাজ শিখবে। তা কাজ ভালোই শিখিল্। তখন বন্দক দিয়ে মোবাইল সারানর ম্যাশিন ট্যাশিন কিনিলো।'

'কাজ করত?'

'মাথাভাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডের কাছৎ সুটুঙ্গা মোবাইল হাউস আসে। সেইখানে বসত। বাড়ি আসত না। কামাই খারাপ হইত, ত্যামন না। কিন্তু পোবলেমটা কি জানেন, এক কাজে বেশি দিন মন থাকত না রবির। তবে যা-ই করত, কামাইত। তারপর শুনলাম ভূটান গ্যাসে কনস্টাকসনের কাজে। আপনের কাজে কখন গেল?'

'জানতেন না?'

'ভূটান যাবার পর কানেকশন কাটি গেল। তারপর

পুলিশ আসিল্। কৈল, ছাওয়াটা মরিসে! লাস পাইসে!'

গলা ধরে গেল রবির কাকার। হাত দিয়ে চোখ মুছলেন। 'কী যে হৈলে আজকালকার ছাওয়াগুল্যার। দ্যাশের জমি-বাড়ি-খেতি সারি টাউনে চার পাস হাজার টাকায় লেবার খাটিৎ যায়! এটেই না চাস করতিস? খায় কায়?'

নন্দন বর্মা চুপ করে শুনছিলেন। রবির কাকার অন্তরে ভাস্তার জন্য লুকিয়ে থাকা ভালোবাসার পরিচয়টা পেয়ে খুশি হচ্ছিলেন তিনি। টাকাটা এর হাতে দেওয়া যায়।

রবির কাকা স্বাভাবিক হলে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'রবির বিয়ে দিয়ে পারতেন।'

'চেষ্টা করসিলাম। সে রাজি না। সুনসিলাম মাথাভাঙ্গায় অনেক মাইয়া সাথৎ কানেকশন আসিলো। ভাবসিলাম তাদের একটা ধরি আনিবেক।'

নন্দন বর্মা ইশারা করলেন। রাধু বর্মন খামটা এগিয়ে দিয়ে এতক্ষণে কথা বললেন, 'তিন মাসের বেতন আর আমার থেকে কিসু মিলায় বিশ হাজার আসে।'

আচমকা মহিলা কণ্ঠে সমবেত কান্নার শব্দ চমকে দিল তাঁদের। নন্দন বর্মা এবার খেয়াল করলেন যে উঠোনের শেষে, ঘরগুলোর ফাঁকে কয়েকজন বিভিন্ন বয়সের মহিলা জড়ো হয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিল। তাঁরা সবাই কেঁদে উঠেছে।

১৪

সামনেই একটা মেলা বসবে স্কুলের মাঠে। সে নিয়ে পঞ্চায়েতে জরুরি মিটিং ছিল। সাইকেল-বাইকের স্ট্যান্ডের বরাত কে পাবে, তা নিয়ে একটু কোন্দল হলেও ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেছে। এতে মনোজের বেশ ভূমিকা ছিল। ব্লক প্রেসিডেন্ট তাঁকে যাওয়ার সময় অভিনন্দন জানিয়েছেন। মনোজ বেশ খুশিয়াল মেজাজে পঞ্চায়েত ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কোন মদ খাওয়া যেতে পারে। রিয়া তাঁকে বলেছে, ফালতু বাইরে খাওয়ার দরকার নেই। কিনে এনে বাড়িতে বসে খাওয়াটাই ভাল। কিন্তু রিয়া যতই ইন্টেলেকচুয়াল হোক, সে তো মদ খায় না। আড্ডায় বসে খাওয়ার সুখটা বুঝবে কী করে? তাই মনোজ ঠিক করেছে, খানিকটা খেয়ে বাড়িতে ঢুকে বাকিটা খাবে। রিয়ার সামনে বসে বাংলা খাওয়া যায় না। ভালো হুইস্কি খেতে হয়। কিনতে গেলে গাঁড় ফাটে।

মনোজ শেষ অবধি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে সিদ্ধান্তে আসা নিয়ে আলোচনার লোক খুঁজছিল। লোকের অবশ্য অভাব দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সব ক-টা শালা বিনেপয়সায় খেতে চাইবে।

আরও একটু এদিক ওদিক পর্যবেক্ষণ করে সন্দীপ জানাকে পেয়ে গেল সে। একটা আলুর চপের দোকানের পাশে বেঞ্চিতে বসে কাকে জানি কী বোঝাচ্ছে। মাষ্টারদের এই একটাই দোষ। লোক পেলেই বোঝায়। তবে ফোটো খারাপ তোলে না। রিয়ার ফোটোটা দারুণ হয়েছে। ফেসবুকে আর কোনও ছবি এত লাইক পায় নি।

মনোজ দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু পরেই চোখাচোখি হল সন্দীপ জানার সঙ্গে। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে বলল, 'কেমন আছেন দাদা?'

'ব্যস্ত নাকি?'

'না না!' প্রায় আর্তনাদের সুর শোনা গেল। কয়েক লাফে রাস্তা টপকে এদিকে এসে মনোজের তিন হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, 'বলুন! আমি এমনি সময় কাটাচ্ছিলাম। আসলে এদিকটায় ইন্টারনেটের স্পিডটা ভালো থাকে তো, তাই।'

'দারুটারু খান না কি?'

সন্দীপ জানা যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ লজ্জা পেয়ে বেগুনি হয়ে গেল।

'আরে লজ্জা পাচ্ছেন কেন? মাষ্টার হলে কি ড্রিঙ্ক করতে নেই? স্যার হয়েছেন বলে কি বিয়ের পর ইয়ে করবেন না?'

'হেঁ হেঁ হেঁ!'

'বাজারে ভালো হুইস্কি কী যাচ্ছে বলুন তো?'

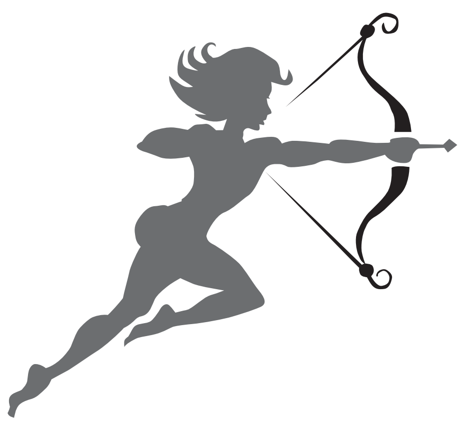

মনোজ বেশ খুশিয়াল মেজাজে পঞ্চায়েত ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কোন মদ খাওয়া যেতে পারে। রিয়া তাঁকে বলেছে, ফালতু বাইরে খাওয়ার দরকার নেই। কিনে এনে বাড়িতে বসে খাওয়াটাই ভাল। কিন্তু রিয়া যতই ইন্টেলেকচুয়াল হোক, সে তো মদ খায় না। আড্ডায় বসে খাওয়ার সুখটা বুঝবে কী করে? রিয়ার সামনে বসে বাংলা খাওয়া যায় না। ভালো হুইস্কি খেতে হয়। কিনতে গেলে গাঁড় ফাটে।

'সে তো মিনিমাম ময়নাগুড়ি যেতে হবে দাদা! তবে—।'

'আবার লজ্জা পাচ্ছেন! আমার বউও বলছে ইদানিং টেস্ট করবে!'

'বলছিলাম যে আমার স্টকে একটা পড়ে আছে। যদি মনে কিছু না করেন—।'

'পড়ে আছে মানে? খান নি কেন? ভুটানি মাল নাকি?'

'না দাদা! স্কচ। হাজার তিনেকের মত দাম। ভয়ে খেতে পারছি না।'

'পুরোটাই দেবেন?'

'আপনাকেই তো দেব।'

মনোজ পলকের জন্য ভাবল রিয়া স্কচ টেনে ব্রেসিয়ার পরে মাতলামি করছে। তাঁর পুরুষাঙ্গে হিল্লোল খেলে গেল। রিয়া যদি সত্যিই খায় তবে স্কচ দিয়েই ভালো। পরের দিকে বাংলা টানবে।

'এ হে! আপনি তবে কী খাবেন সন্দীপবাবু?' মনোজ আফশোষের সঙ্গে বলে। 'আপনাকে তবে একটা নিপ কিনে দিই?'

'তা দিন। তবে ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে। রাম দিলেই হবে।'

মনোজ অভিভূত হয়ে গেল। এত কম খরচে হয়ে যাবে ভাবে নি। বলল, 'আমি বাড়ি যান। আমি আসছি।'

মাষ্টারের থাকার জায়গা কাছেই। মনোজ তাঁর সাকরেদ ঝন্টোকে ডেকে রামের নিপ আনিয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যে হাজির হল সন্দীপ জানার ঘরের সামনে।

ঘরটা বেশ বড়। তবে আসবাব অতি সামান্য। সন্দীপ জানা মনোজকে খাতির করে একটা টুলে বসিয়ে খবরের কাগজে প্যাঁচান লম্বা চৌকো বাক্সটা বের করল ট্রলি ব্যাগ থেকে।

'আপনারা একসঙ্গে সত্যিই ড্রিঙ্ক করবেন?'

মনোজ একটু হেসে বলল, 'ফেসবুকে দেবেন নাকি?'

'না না! কী যে বলেন!' সন্দীপ জানা হাহাকার করে ওঠে। নিজের মিসেসের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করা কি যে সে পারে দাদা! আপনারা অ্যাডভান্স ভাবেন। হেঁ হেঁ হেঁ—।'

'আসলে কি জানেন, রিয়ার ওপর দিয়েও খুব স্ট্রেস যাচ্ছে। রবিটা কী ভাবে মরল দেখলেন?'

'একটা পুজো টুজো দিন।'

'বলছেন?'

খানিকটা সময় সম্ভাব্য পুজো নিয়ে মাষ্টারের সঙ্গে আলোচনা করে হালক মুডে বেরিয়ে এল মনোজ। এরপর বেশ রাতে চার নম্বর পেগ গলায় ঢেলে ফুরফুরে মেজাজে সে সামনে বসে থাকা রিয়াকে বলল, 'অনেক দিন ধরে একটা এক্সপেক্টেশন আছে।'

রিয়া সত্যিই একপাত্র খেয়েছে। তারপর থেকে সে সব কথাতেই মিটি মিটি হাসছে। সেই হাসি ফালাফালা করে দিচ্ছে মনোজকে। এবারেও সে হাসল। বলল, 'ক।'

'একটা সিনেমায় দেখিসু মুই— নায়িকা ব্রেসিয়ার পিন্ধি বসিছে। হিরো দারু ঢালি দিসে বুকের মধ্যৎ। তারপর উয়ার প্যাটৎ আসি পড়িসে দারু। হিরো স্যালায় তখন চাটিছে। মুইঅ স্যালায় চাটিম্।'

'এই কথা?'

রিয়া হাত তুলে খোঁপা বাঁধল। আঁচলটা ফেলে দিয়ে ব্লাউজ খুলল। বলল, 'ব্রেসিয়ারখান ভিজাবি ক্যানে? তুই ডিরেক্ট মোর তনৎ ঢালি দে।'

ব্রেসিয়ার খুলে পড়ল। কাঁপা কাঁপা হাতে হুইস্কি ঢেলে দিল মনোজ। স্তনবিভাজিকার মধ্যে দিয়ে হুইস্কির ধারা নেমে এলো তিরতির করে। জিভ বের করে বহুদিনের লালিত ইচ্ছে পালন করতে ঝুঁকে পড়ল মনোজ।

কিন্তু একটু গোলমাল হল। জল ছাড়া হুইস্কি জিভে পড়তেই মুখ কুঁচকে গেল মনোজের। সিনেমার হিরো কি জল মিশিয়ে ঢেলেছিল? রিয়া বড় বড় চোখে দেখছিল মনোজের কীর্তি। বিকৃত মুখ দেখে সে হেসে উঠল খিল খিল করে। হাসি থামাতে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মনোজ। বাঘিনির ওপর।

১৫

মেয়ের সঙ্গে পরেশ প্রামাণিকের হঠাৎ বেশ দোস্তি হয়ে গেছে। অবশ্য এর জন্য খরচা করতে হয়েছে তাঁকে। তেরো হাজারি মোবাইল কিনে দিতে হয়েছে একটা। সেই দামড়া ফোনটা নিয়ে মেয়ে এখন বারান্দায় বসে কী সব করে যাচ্ছে। পরেশ প্রামণিক তাঁর পাশে বেঞ্চিতে বসে বললেন, 'মোবালটা ডিস্টব দিচ্ছে না তো?'

'না।'

'দিলে বলবি। গ্রান্টি আছে। পুরা এক বছরের

গ্রান্টি।'

'বলব।'

'সন্দীপ মাস্টরকে পাঠাইলি?'

'কী?'

'ওই ফেন্রিকেস্ট কেস্ট না কী জানি বলিস?'

'ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। পাঠাই নি।'

'কেন?' অসন্তোষ চেপে রেখে বললেন পরেশ প্রামাণিক।

'টিচারদের রিকোয়েস্ট পাঠালে খালি জ্ঞান দেয়।'

'দিক না! শুনবি। জ্ঞান শুনলে মাস্টররা খুশি হয়। মাষ্টর ভালো ফোটো তোলে। বলবি তুলে দিতে।'

'আমি এখন বিয়ে করব না বাবা!'

পরেশ প্রামাণিক ঝটকা খেয়ে সামলে নিলেন। মোলায়েম গলায় বললেন, 'বিয়ের কথা আসছে কেন? আসলে যা দিনকাল। ভাল ভাল লোকের সঙ্গে কানেকশন রাখলে ক্ষতি নাহ— তাই আর কি! দরকারে বুদ্ধি টুদ্ধি দিবে।'

'আমার বুদ্ধি নেওয়ার লোক আছে।'

'কে?'

'রিয়াদি।'

পরেশ প্রামাণিক চুপসে গেলেন। ভেবেছিলেন মেয়ে অন্য কোনও ছেলের নাম বলবে। মাস্টরের মত কেউ। রিয়াদি তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। একটু চুপ থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'রিয়াদির ব্যাপার আলাদা। বড় বাড়ির বড় ব্যাপার। সে তোর মত ভুল করে নাই। ভাল ঘরে বিয়ে করেছে। গার্জিয়ানের কথা শোনে তোর রিয়াদি।'

মেয়ে এবার মুখ তুলে বাপের চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'বলেছি তো রবির সঙ্গে মিশে ভুল করেছি। ভয় নেই। আর করব না। আমি চাকরি করব।'

পরেশ প্রামাণিক চুপসে চামড়া হয়ে গেলেন পুরোপুরি। এ তো টাউনের মেয়েদের মত কথা! শালগুড়ি টাউন হয়ে যাচ্ছে নাকি?

'রবির ব্যাপারে কিছু জানলা?' মেয়ে সুর বদলে সহজ গলায় জিগ্যেস করল। 'ও কি ক্রিমিনাল ছিল?'

নিজেকে সামলে নিয়ে পরেশ প্রামাণিক বললেন, 'তেমন কিছু জানা যায় নাই। তবে ক্রিমিনাল না হলে এভাবে কেউ মার্ডার হয় না। তুই যে মিশতি, কিছু টের পাইতি না?'

'ও এমনিতে ভাল ছিল। আমরা কয়েক দিন মিশছিলাম। তবে—'।

থমকে গেল মেয়ে। পরেশ প্রামাণিক কৌতুহলী গলায় জিগ্যেস করলেন, 'তবে?'

'রিয়াদির থেকে জেনেছি ওর ক্যারেকটার খারাপ ছিল।'

অন্যদিকে তাকিয়ে কথাটা বলল মেয়ে। তারপর ডুবে গেল মোবাইলে। পরপর কয়েকটা প্রশ্ন করে পরেশ প্রামাণিক উপলব্ধ করলেন মেয়ে আর কোনও কথা বলবে না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে বিড়বিড় করে বললেন, 'এখন আবার রিয়াদি মাড়ানো হচ্ছে! নির্ঘাৎ ওই মাগীটার কথায় মাস্টরকে ফেন্রিকেস্ট পাঠায় নি হারামজাদি মেয়ে!'

তারপর একটু শান্ত হয়ে ভাবলেন যে রবি ক্যারেকটার ভাল ছিল না। ব্যাপারটা কী? রিয়াদি জানল কী ভাবে? রবির কি আরও মেয়ের সঙ্গে ঘসাঘসি ছিল? সে মেয়েগুলো কি শালগুড়ির? সেটাই হবে। না হলে রিয়া মাগী জানবে কী ভাবে?

কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে পরেশ প্রামাণিকের মেজাজ ফিরে এল। জলদি সাজগোজ বদলে বেরিয়ে পড়লেন বাজারের দিকে। রাধু বর্মনের বাড়িতে গেলে কিছু খবর পাওয়া যেত। কিন্তু যেতে সাহস হয় না।

১৬

রাত প্রায় এগারোটা। নন্দন বর্মা খাওয়ার পর একটা খাতা খুলে ভাবছিলেন আর লিখছিলেন। এবার লেখাটা পড়া শুরু করলেন।

'আজ সকালে রবির উত্তরাধিকারীকে টাকা দিতে রাধু আর আমি ওর কাকার বাড়ি গেলাম। কাকা আর দশজন সাধারণ মানুষের মত একজন। রবিকে স্নেহ করতেন। তাঁর ভাল চাইতেন। কিন্তু রবি ছিল ওদের বাড়ির সকলের মধ্যে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। সে নিজের

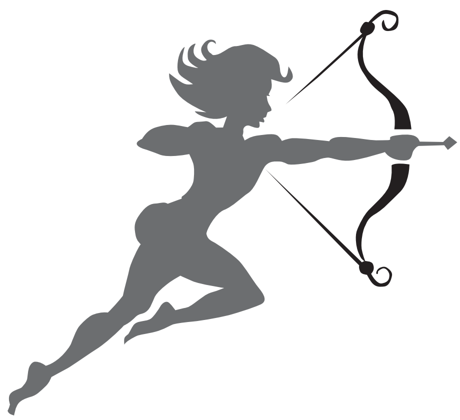

'বাজারে একটা রটনা আছে যে পরেশ প্রামাণিকের মেয়ের সঙ্গে রবির কিছু মেলামেশা ছিল। পরেশ প্রামাণিক একটি অতি ধড়িবাজ লোক। কিন্তু রবিকে খুন করার মুরোদ তাঁর আছে বলে মনে হয় না। রবির খুন কোনও একজন লোকের কাজ নয়। সে রাধুর বাড়িতে গেল মাল আনতে দুপুরে। তারপর সে গেল শিঙ্গিহাটায়। তাঁর ফোনের কল লিস্টে রহস্যময় কোনও কল নেই।

চেষ্টায় অনেক কাজ শিখেছিল। মাধ্যমিক পাস না করতে পারলেও কাজ করে রোজগার করতে শিখেছিল। মাথাভাঙ্গার সেই মোবাইলের দোকানে ফেরার পথে ঢুকেছিলাম। রাধুর ইচ্ছে ছিল না। আমিই একটু জোর করে গেলাম। দোকান মালিকের নাম সারথি রায়। বছর চল্লিশের ছেলে। কিছু লুকোয় নি বলেই মনে হল। জিগ্যেস করতে নিজের থেকেই বলেছে, রবি সেখানে কাজ করত। কাজের চাহিদা ছিল। কিন্তু সে কম্পিউটর বেচার কাজ নিয়ে মোবাইলের কাজ ছেড়ে দেয়। তারপর চলে যায় ভুটানে। লেবার পাঠানর কাজ নিয়ে। তারপর গত বছর ভুটান থেকে চলে আসে। কিছুদিন মাথাভাঙ্গায় একটা দোকানে কাজ করেছিল। তারপর আর দেখা হয় নি।'

নন্দন বর্মা এরপর লাল কালিতে আলাদা অনুচ্ছেদে লিখেছেন—

'দোকান মালিক বলেছে, রবির অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল। কোনওটাই টেঁকে নি। তবে সে নিয়ে কোনও ঝামেলাও কখনও হয় নি।'

এইটুকু দু-বার পড়ার পর নন্দন বর্মা একটা কাগজের টুকরোয় লিখলেন—

১) রবির মধ্যে মেয়েদের আকর্ষণ করার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল।

২) রবির কাকা বলেছিল যে ভুটানে যাওয়ার পর রবির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আর হয় নি। কিন্তু রবি ভুটান থেকে ফিরে মাথাভাঙ্গায় ছিল। তাহলে কি সে বাড়িতে যোগাযোগ করে নি? নাকি কাকা মিথ্যে বলছে?

তারপর একটু ভেবে লিখলেন—

৩) কাকার মিথ্যে বলার দরকার নেই। রবি হয় তো বাড়িতে জানায় নি। মনে হয় তাঁর গ্রামের পরিবেশ ভাল লাগত না।

কাগজের টুকরোটা পেপার ওয়েটের নিচে রেখে নন্দন বর্মা আবার পড়া শুরু করলেন —'রবি এরপর কাজের সন্ধানে রাধুর দোকানে এল। শালগুড়ির মত জায়গায় এই সামান্য কাজের জন্য তাঁর আসাটা বিস্ময়কর। মাথাভাঙ্গার অর্থনীতি তুলনায় অনেক মজবুত। সেখানে সে ভাল কাজ খুঁজল না কেন?'

আবার টুকরো কাগজটা টেনে এনে তিনি লিখলেন—

৪) রবির শালগুড়িতে কাজ করতে আসাটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কী উদ্দেশ্য?

তারপর আবার পড়তে লাগলেন —'রবি দোকানেই ঘুমোত। ছুটি নিয়ে বাড়ি যেত না। সে ছিল ফিটফাট। রাধু তাঁর ওপর খুশি ছিলেন। কিন্তু শেষ তিনমাস সে মাইনে নেয় নি। ভালো শার্ট কিনেছে। মোবাইল কিনেছে। সে কি টাকা পেয়েছিল কোনও? নাকি টাকা তার কাছে ছিল? থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারণ সে আগে কাজ করত। কিন্তু টাকা থাকলে সে মাইনে নেওয়া হঠাৎ বন্ধ করল কেন? মনে হয় মাইনে নেওয়া বন্ধ রাখার কিছু আগে তাঁর হাতে টাকা এসেছিল। কী ভাবে?'

নন্দন বর্মা টুকরো কাগজে পরের পয়েন্ট লিখলেন—

৫) রবির সঙ্গে কোনও জঙ্গি বা ক্রিমিনাল গ্যাং-এর যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী শালগুড়ি কি তাঁর কাছাকাছি কোনও একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়াটা স্বাভাবিক। হয় তো তাঁর খুন হওয়ার পেছনে নারীঘটিত ব্যাপার আছে।

'বাজারে একটা রটনা আছে যে পরেশ প্রামাণিকের মেয়ের সঙ্গে রবির কিছু মেলামেশা ছিল। পরেশ প্রামাণিক একটি অতি ধড়িবাজ লোক। কিন্তু রবিকে খুন করার মুরোদ তাঁর আছে বলে মনে হয় না। রবির খুন কোনও একজন লোকের কাজ নয়। সে রাধুর বাড়িতে গেল মাল আনতে দুপুরে। তারপর সে গেল শিঙ্গিহাটায়। তাঁর ফোনের কল লিস্টে রহস্যময় কোনও কল নেই। শিঙ্গিহাটায় কেউ তাঁকে দেখে নি।'

লেখা এখানেই শেষ। নন্দন বর্মা উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'শালগুড়ি টু শিঙ্গিহাটা —একটাই বুথ। সবাই সবাইকে চেনে। রবিকে এখানকার অনেকেই চিনে গেছিল। শিঙ্গিহাটা গেলে কেউ না কেউ দেখতই!'

শুতে যাওয়ার আগে তিনি আরও একটা পয়েন্ট লিখে গেলেন—

৬) রবি শিঙ্গিহাটায় যায় নি। ফোনের লোকেশন ধরলে সে গিয়েছিল। কিন্তু ফোন গেলে রবিও যাবে, তার কী নিশ্চয়তা? হয় তো ফোনটা গিয়েছিল। রবি নয়।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

অরণ্যকে বুকে আগলে পেট চালায় বনগ্রাম জয়ন্তি তবু কেন হতভাগ্যের শিকার ?

অনেক বছর আগে একবার ওপরওয়ালার নির্দেশে জয়ন্তি গিয়েছিলাম। ক্ষেত্রসমীক্ষা করে বলতে বলা হয়েছিল ওখানে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা সম্ভব কিনা জানবার জন্য। রিপোর্টে ঠিক কী লিখেছিলাম মনে নেই, কিন্তু ২০১৮ সনের নভেম্বর মাসেও জয়ন্তির ৩০২ টি পরিবারের প্রায় তেরশ বাসিন্দার জন্য কোনও ব্যাঙ্কের শাখা নেই। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এবং নিজস্ব প্রয়োজনেই প্রতিটি জনপদ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। জয়ন্তির মত এমন মন্দভাগ্যের খুব কম জনপদ দেখা যায়। দীর্ঘকালের বনবস্তি, অতীতের ব্যস্ত সমৃদ্ধ গ্রাম। গভীর কালচে সবুজ বৃক্ষ লতাগুল্ম। প্রপিতামহ সম প্রাচীন গাছ, নিজেই নিজের ইতিহাস। গ্রামের পাশে বয়ে যায় জয়ন্তি নদী। বর্ষায় প্রখর স্রোতস্বিনী, হেমন্তে শীর্ণতোয়া কিন্তু গতিশীলা সঙ্গীত মুখর, বসন্তে প্রায় নির্জলা। পাহাড় থেকে বয়ে নিয়ে আসে বালি আর ছোট বড় পাথর। নদীর উত্তর-পূর্ব দিকটা ঘিরে আছে ধূসর দোপাট্টা গায়ে নীল পাহাড়। নদীর নামেই গ্রাম।

এক সময়ে পাহাড়ে ডলোমাইট নিষ্কাশন চলত। বড় বড় বেশ কিছু কোম্পানি মাইনিং এর কাজে যুক্ত ছিল। বেঙ্গল লাইম স্টোন কোম্পানি, নর্থ বেঙ্গল ডলোমাইট কোং, জয়ন্তি লাইম কোং এবং বক্সা মাইন কোং- র মত কোম্পানি গুলির রমরমা ছিল চোখে পড়ার মত। জয়ন্তি নদীর পূর্ব পারে ভুটিয়া বস্তি ফরেস্ট বিট অফিসের পাশ দিয়ে উত্তরের রাস্তায় কিছুটা হাঁটলেই হদিস মিলতে পারে পুরনোদিনের কিছু সাক্ষ্য। মাইনিং কোম্পানির ম্যানেজারদের বাংলো, বাবুদের বাসা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। ডিনামাইটের ব্যবহার ছাড়াই মাইনিং-এর এমন ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত বিরল। ১৯৮৩-৮৪ সনে বন ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে ডলোমাইটের মাইনিং চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৮৩ সনে তৈরি হল বক্সা টাইগার রিজার্ভ ৭৬১ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি জুড়ে। বাঘের সুরক্ষিত আবাসের জন্য কি মানুষের জীবন-জীবিকা উপেক্ষিত হল ? আমার মত অনেকেই বিশ্বাস করে বক্সায় বাঘ নেই, নেই, নেই।

ডলোমাইট, পাথর, কাঠ বহনের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে রাজাভাতখাওয়া হয়ে ট্রেন চলাচল করত। সত্যিকারের লাইফ লাইন। সেই ট্রেনে মানুষজন যাতায়াত করত, ডাক আসত, কয়লা আসত, চায়ের পেটি যেত, কাঠ ও পাথর যেত, খাদ্য খাওয়ার জিনিস থেকে ওষুধপত্র এসব কিছু ট্রেনেই আনা-নেওয়া হত। একটা ট্রেন সার্ভিস যে কোনও জনপদের অন্তরে এমন একটা মনুমেন্ট তৈরি করতে পারে তা জয়ন্তিতে না এলে, প্রৌঢ়দের সাথে আলাপ না করলে বোঝা যাবে না। মাইনিং বন্ধ হতেই ট্রেন তার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা হারাল। ১৯৮৬ সনের ৩১ শে অক্টোবর ট্রেনের শেষ যাত্রার

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

এলাকার যুবকরা নিজেদের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িয়ে নিতে শুরু করল। এই তরুণরাই এলাকার পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এরাই জয়ন্তি এলাকায় চুরি করে গাছকাটা বন্ধ করেছে,বন্যপ্রাণী হত্যা নিবারণ করেছে, বনে প্লাস্টিক ফেলা বন্ধ করেছে। 'ইকো ট্যুরিজম গাইড' হিসেবে সরকারি মান্যতা মিলেছে।

ক্ষণটিতে অনেকেরই চোখের জল বাধা মানে নি। ঐ তারিখটি প্রবীণরা মনে মনে কালা দিবস হিসেবে এখনও স্মরন করে।

জয়ন্তি নদী বাঁধের ডান দিকে তাকালে নদীর বক্ষে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় পিলার, যা একসময় নদীর উপর ব্রীজটি ধারণ করত। নদীর ওপারে চা বাগান ও বস্তির মানুষজন যাতায়াত করত এই ব্রীজ ও জয়ন্তি বাজার হয়ে। ফাঁসখাওয়া, চুনিয়া, রহিমাবাদ, তুরতুরি, কার্তিকা, ধওলাঝোড়া, জয়ন্তি, রায়ডাক ইত্যাদি দশটি চা বাগান ছাড়াও বস্তিবাসীর যোগাযোগের এই রাস্তা ছিল রাজ্য পূর্তদপ্তরের অধীন। ১৯৯৩ সনের বন্যায় সেই ব্রিজ ভেসে যায়, জয়ন্তি বনবস্তি আরও নিঃস্ব হয়, চূড়ান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাজনীতির ব্যাপারীরা নতুন ব্রীজ তৈরির ব্যাপারে প্রতিটি নির্বাচনের সময় কথা দেয় এবং ফল ঘোষনার পর স্বাভাবিক ভাবেই ভুলে যায়। বিস্তীর্ণ এলাকার যে মানুষজন চা বাগান থেকে শহরে যেতে-আসতে জয়ন্তির রাস্তা ব্যবহার করত, বাজারে আসত তাদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। এখন আলিপুরদুয়ার থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় দুটো বাস ছাড়া রাজাভাতখাওয়া থেকে অটো বা প্রাইভেট গাড়ি করে বাসিন্দারা যাতায়াত করে থাকেন। রাজাভাতখাওয়া থেকে এই অরণ্যপথে যাত্রা সত্যি রোমাঞ্চকর, সারাটা পথ ঝিঁঝি-র ঘন্টা ধ্বনির মত ডাক ডুয়ার্সের সিগনেচার মিউজিক।

এমন মন পাগল করা প্রকৃতির অলৌকিক সান্নিধ্য পেতে মানুষ দূর দূরান্তর থেকে বারবার জয়ন্তিতে ছুটে এসেছে। পূর্ত দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর, বন দপ্তরের বাংলো ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন কর্পোরেশন বা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন-এর অবকাশ গৃহ সর্বদাই পর্যটকদের পছন্দের আশ্রয়স্থল। ক্রমশই পর্যটকদের ভীড় বাড়ছিল। চুনিয়া ঝোড়া ওয়াচ টাওয়ার, ভূটিয়া বস্তি ওয়াচ টাওয়ার, পাহাড়ের মাথায় রহস্যময়ী 'পুকুরি' জলাশয় বা একটু দূরে বড় ও ছোট 'মহাকাল' বহুদিন ধরে মানুষকে কাছে ডেকেছে। জয়ন্তিকে কেন্দ্র করে বক্সা ফোর্ট ও লেপচাখায় পর্যটক সমাগম বাড়তে থাকল। এলাকার যুবকরা নিজেদের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িয়ে নিতে শুরু করল। লেখাপড়া ইতিমধ্যে কিছুটা বিস্তার লাভ করেছে। প্রাথমিক ও হাই স্কুল আছে। অনেকেই পড়াশুনো কিছুটা এগিয়ে নিতে গিয়ে থমকে গিয়েছে, বনের পথে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে আলিপুরদুয়ার যাওয়া-আসা সব সময় সম্ভব হয় না।

এই তরুণরাই এলাকার পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এরাই জয়ন্তি এলাকায় চুরি করে গাছকাটা বন্ধ করেছে,বন্যপ্রাণী হত্যা নিবারণ করেছে, বনে প্লাস্টিক ফেলা বন্ধ করেছে। 'ইকো ট্যুরিজম গাইড' হিসেবে সরকারি মান্যতা মিলেছে। জামা বা টি শার্টের পকেটে 'ইকো ট্যুরিজম গাইড' লেখা ব্যাজ তারা ব্যবহার করছে। আমার স্থানীয় সহচর প্রদীপ কুমার দে -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'ইকো ট্যুরিজম বলতে কি বোঝেন ?'? প্রদীপবাবুর সোজা সাপটা উত্তর 'প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করে যে পর্যটন তাই ইকো ট্যুরিজম'। অন্যদিকে অক্সফোর্ড ইকোলজির অর্থ বলেছে 'the relationship between living things and their surrounding'। কারও মনে হতে পারে সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ কিন্তু এরই মাঝে লুকিয়ে আছে সমস্ত টেকনিক্যাল ব্যাপার স্যাপার। মানুষকে অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বন ও বন্যপ্রান রক্ষা করতে হবে। সাধারন মানুষকে সচেতন করার কাজে গাইডরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রদীপের সঙ্গে যাচ্ছিলাম চুনিয়া ঝোড়া টাওয়ারের পথে, জয়ন্তি নদীর পারে একটি বহিরাগত পরিবার গাড়ি রেখে পিকনিক করছিল। ছড়ানো ছিটানো থার্মোকলের থালা, চিপসের প্যাকেট আরও নানা রকম আবর্জনা। প্রদীপ গাড়ি থেকে নেমে ওদের বুঝিয়ে বলেছিল, জায়গাটা পরিস্কার রাখতে। সন্ধ্যায় পথে ফেরার সময় গাড়ির হালকা আলোয় ময়লা কোনও কিছু আমাদের চোখে আর পড়েনি।

অনেক সময় গাইডরা বিনা পারিশ্রমিকে সেনসাস পেট্রোলিং, পাহারাদারি, সচেতনতা বাড়াতে সরকারকে সাহায্য করে থাকে। প্রদীপ বলেছিলেন ১৯ শে নভেম্বর ২০১৮ 'পুকুরি পাহাড়' এলাকা থেকে মানুষের ফেলে রেখে যাওয়া প্লাস্টিক সংগ্রহ অভিযান চালাবেন এলাকার

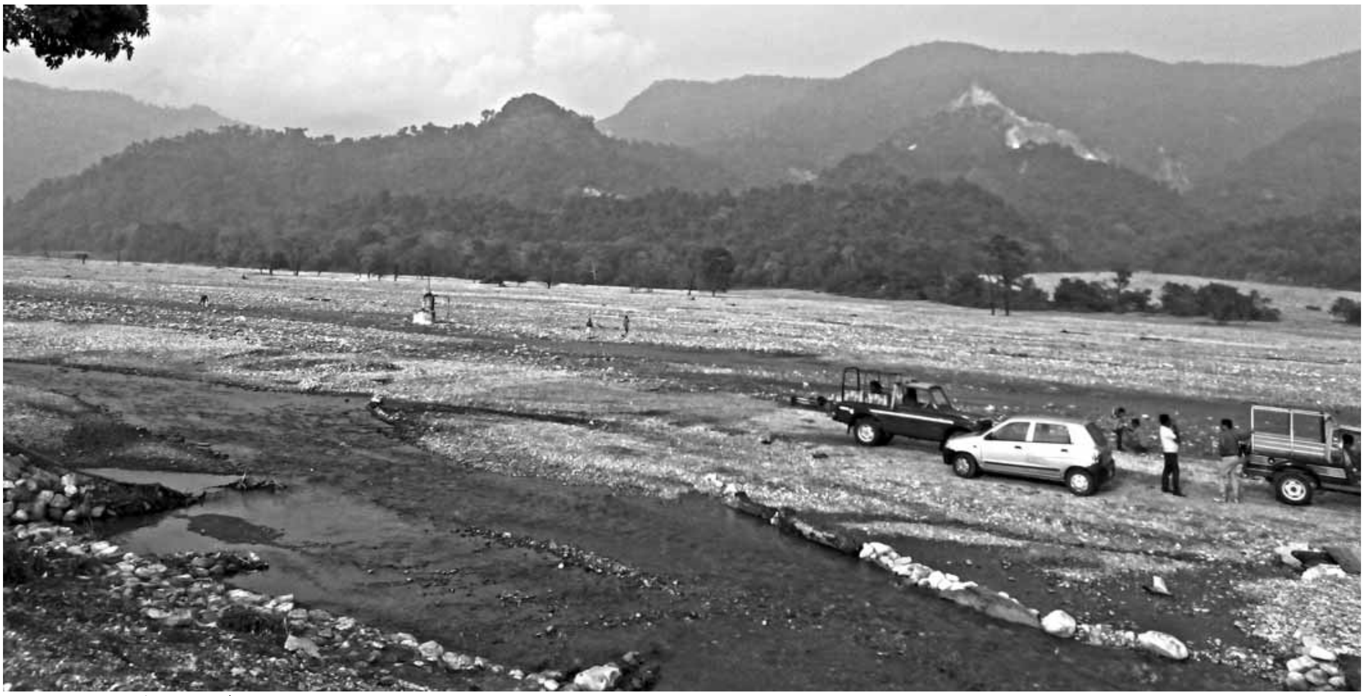

এই জয়ন্তি নদী বর্ষায় হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর

সমস্ত গাইড।

নদীর বেডে বসে কাটিয়েছি কালীপুজোর রাতের অনেকটা সময়। জৌলুষহীন কালীপুজোর প্যান্ডেল, টুনি ল্যাম্পের কিছু মৃদু আলো, দু-একটা লঙ্কাবাজীর একান্তই কৃপণ আওয়াজ। জিজ্ঞেস করেছিলাম 'কালিপুজো আলোর উৎসব, এখানে এমন সাদামাটা পুজো কেন?' জেনেছিলাম গতপ্রায় দশ বছর নদী থেকে বালি-পাথর সংগ্রহ করে ট্রাকে তোলাটাই এলাকার গরীব মানুষদের রোজগার ছিল যেটা পরোক্ষ ভাবে জয়ন্তি নদীর নাব্যতা রক্ষায় সাহায্য করত। এখনই তো নদীর বেড গ্রামের সমান বা অল্প উঁচু, এরপর হড়পা বান এলে কী হবে? বালি ও পাথর তোলা ৩১শে মার্চ ২০১৮ থেকে বন্ধ হয়েছে। যদিও গরুমারায় মূর্তি নদীতে বালি ও পাথর তোলা চলছে রোজ। একই আইন কি একেক জায়গায় একেকভাবে পর প্রযোজ্য? নাকি এ কোনও আইনেরই সুচারু ফাঁক? আমার স্বল্পজ্ঞানে এর উত্তর না মিললেও এটা কঠোর বাস্তব যে জয়ন্তির রোজগারহারা মানুষগুলির এবছর পুজো গভীর সঙ্কটে কেটেছে।

শুধুমাত্র জয়ন্তিতেই ৩৪ জন ইকো ট্যুর গাইড কাজ করেন। প্রত্যেকে প্রতিদিন কাজ পান না। ১৫ই জুন থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর এই তিন মাস বনে পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ। এলাকার রোজগার তখন শূন্য। জঙ্গলে গরীব মানুষ খুঁজে বেড়ায় মাটি আলু, মাশরুম, পিপুল, রিঠা ফল, নাগ বেল,শাল ধূনো ও মধু। গাইড অমিত প্রসাদ (টিঙ্কু) বলেছিল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এখনকার মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষও একসময় তাঁর পারিবারিক জড়িবুটির ব্যবসার জন্য আরও অনেকের মত এই সব এলাকা থেকে নানারকম বনজ পাতা, ফল, ফুল, শিকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। একবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজ উৎপাদন সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রীর মুখ থেকে ভেষজ সংগ্রহের এই কাহিনিও শুনেছি।

জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় রিসোর্সের উপর চাপ বেড়েছে। প্রকৃতির অনিন্দ্য নির্জনতার আমেজ নিতে, আসা-যাওয়া বাড়ল পর্যটকের। ভোরের জয়ন্তি

গতপ্রায় দশ বছর নদী থেকে বালি-পাথর সংগ্রহ করে ট্রাকে তোলাটাই এলাকার গরীব মানুষদের রোজগার ছিল যেটা পরোক্ষ ভাবে জয়ন্তি নদীর নাব্যতা রক্ষায় সাহায্য করত। এখনই তো নদীর বেড গ্রামের সমান বা অল্প উঁচু, এরপর হড়পা বান এলে কী হবে? বালি ও পাথর তোলা ৩১শে মার্চ ২০১৮ থেকে বন্ধ হয়েছে।

বা সাঁঝের জয়ন্তির রূপে মোহগ্রস্থ হয়নি এমন ভ্রমন পিপাসু খুঁজেই পাওয়া যাবে না। থাকার জায়গা তখন দু-একটা সরকারি বাংলো বা রেস্ট হাউসে। হতাশ হয়ে অনেক পর্যটক ঘুরে যেতেন। কিছু নাছোড়বান্দা পর্যটক স্থানীয় মানুষদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া শুরু করলেন, বাড়ির খাওয়া দাওয়া, একই টয়লেট শেয়ার করা, যেন কুটুম এসেছে বাড়িতে। এটাই তো হোম স্টে-র ভাবনা। সবার বাড়িতে পরিকাঠামো ঠিক মত নেই। যাদের ছিল বা অল্প কিছু মূলধন বিনিয়োগের সাধ্য ছিল এমন ২৪ টি বাড়িতে হোম স্টে চালু হয়েছিল। শুধুমাত্র পরিবারের শ্রম দিয়ে অতিথিদের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছু মানুষ রান্নার কাজ, সহকারীর কাজ এবং সাফাই কর্মীর কাজ করতে শুরু করল, এমন শ্রমজীবি মানুষের সংখ্যাও শতাধিক। তাছাড়াও পরোক্ষ ভাবে অনেক বেশি মানুষ পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। যতটুকু যা চলছিল তা প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করে। পরিবেশের এমন পাহারাদার জয়ন্তি ছাড়া ডুয়ার্সের অন্য কোথাও আমার চোখে পড়ে নি। তবে যারা আইন মানছেন না তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আওয়াজ তুলতেই হবে।

'অরণ্যের অধিকার আইন'-এ বনবস্তির মানুষদের যে সব সুবিধা পাওয়ার কথা ইদানিং আমলারা সে বিষয়েও যথেষ্ট নজর রাখেন। তবে এক সময় বনদপ্তর বছরে ৩২.৫০ টাকা খাজনা সংগ্রহ করত, ১৯৯৫ সন থেকে খাজনা আদায় বন্ধ। অনেকে বলছেন খাজনার টাকা কয়েকগুন বেশি আদায় করা হয়েছিল সেটাই হয়ত 'অ্যাডজাস্ট' করা চলছে।

এরপর হঠাৎ পরিবেশপ্রেমীদের স্বঘোষিত নেতারা গ্রীন বেঞ্চে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে মামলা ঠুকলেন। হোম স্টে গুলিকে বন্ধ করার আদেশ জারি হল। বিশেষ করে বিটিআর-এর কোর এলাকায় পর্যটন কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। আমি নিজে আইনের ছাত্র এবং মহামান্য আদালতের উপর শ্রদ্ধাশীল, আমার বিশ্বাস সঠিক তথ্য ও সাক্ষ্য দিয়ে আদালতকে সাহায্য করলে হয়ত বা আদেশ অন্যরকম হলেও হতে পারত। হোম-স্টের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কিছু মাপকাঠি বেঁধে দিলে জয়ন্তি গ্রামের মানুষগুলি বাঁচত। একবার শেখর, প্রদীপ, হিমাল, নাইডু-দের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম পর্যটন ছাড়া ওই সব মানুষদের রোজগারের দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই, নতুন কোনও ঠিকানায় অনিশ্চিত জীবিকার খোঁজে যাওয়ার বয়সও ওরা পেরিয়ে এসেছেন। প্রদীপ দে-র বাবা সেই কবে ত্রিপুরার চাঁদপুর থেকে এসেছিলেন। প্রদীপদের জন্ম বেড়ে ওঠা, পড়াশুনা, জীবিকা সবকিছুই এই জয়ন্তি। বাজারে বাড়ি, সংলগ্ন মনিহারি দোকান। কালিপুজোর রাতে বিকিকিনি ভালই জমেছিল। বিএড পড়ুয়া পুত্র রাস্তার ধারে বাজির দোকান লাগিয়েছে। লঙ্কাপটকা ছাড়া শব্দবাজি নেই। ওদের 'আলতাপুরী হোম স্টে'-র সামনে দাড়িয়ে তুবড়ি ও রঙ মশালের আলোয়, সচেতনতার নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম।

সেদিন আমাদের ছোট গাড়িটি জয়ন্তি নদীর চরে পার্ক করা ছিল। কালিপুজোর সেই রাতে গাড়িতে বসে থেকে দেখছিলাম হঠাৎ কিছু অত্যুৎসাহী পর্যটক নদীর চরে সদলবলে বাজি পোড়াতে চলে এলেন। চারদিক আলোকিত করে একটা তুবড়ি পোড়ানো হল। আর একটি পোড়ানোর তোড়জোড় চলছে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটে এল দুজন স্থানীয় মানুষ, দলটিকে বাজি পোড়াতে নিরস্ত করতেই তাদের আবির্ভাব। এমন পাহারাদারও যদি বন ও পরিবেশ রক্ষা করতে না পারে তবে কে পারবে বলুন তো?

হাংরি রিপোর্টার

উত্তরের দৈনিকের দিনগুলি ছিল কঠোর পরিশ্রমের

তুষার প্রধান

শুরুর দিকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সম্পাদক হিসেবে দক্ষিণারঞ্জন বসুর নাম ছাপা হত। 'যুগান্তর' কাগজে কাজ করার কারণে দক্ষিণারঞ্জন বসু নামটির প্রতি পাঠকদের আলাদা মমত্ব ছিল। দক্ষিণারঞ্জন বসু যুগান্তরের দৌলতে পাঠক সমাজের কাছে যে সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন, তা ছিল সত্যিই তাকিয়ে দেখার মত। দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রথম যখন শিলিগুড়ি যান, তখন তাঁকে দেখার জন্য পাঠকের ভিড় ছিল সত্যিই হুমড়ি খেয়ে পড়ার মত। দক্ষিণাদা-ই বলতাম। স্নেহ করতেন। তবে খবরের কাগজের কাজ নিজ হাতে খুব কিছু করতেন না। বিভিন্ন জায়গায় সংবর্ধনা নিয়ে বেড়াতেন। অফিসে যেটুকু সময় থাকতেন তাতে ঘটের উপর ডাব বসালে যেমন মনে হয়, সেরকমই ছিল দক্ষিণাদার ভূমিকা। অবশ্য বেশিদিন তিনি শিলিগুড়ি কোনও সময়েই থাকেননি। প্রথম দিকে অফিসে তার জন্য রাখা সবচেয়ে বড় টেবিলটি মাসের পর মাস অব্যবহৃতই থাকত। বিজ্ঞাপন দপ্তরের কাজের পরিসর ক্রমশ বাড়তে থাকায় একসময় আমি নিজেই দক্ষিণাদার কাছে আব্দার করে বসি, তাঁর ওই টেবিলটা আমার চাই। যেহেতু নিজে তিনি শিলিগুড়ি থাকতেন না, তাই 'মনে ব্যথা' পেলেও ওই টেবিলটি বিজ্ঞাপন দপ্তরকে ছেড়ে দিতে তিনি খুব বেশি সময় নেন নি।

এসময় নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে সম্পাদনার কাজটা করতেন যুগ্ম সম্পাদক বিনয় চট্টোপাধ্যায়। বিনয়দাও আগে ছিলেন যুগান্তরে। অমৃতবাজার পত্রিকার হয়ে দিল্লির সংবাদ প্রতিনিধি পদে ছিলেন। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর শুরু থেকেই তিনি যুগ্ম সম্পাদক। রাশভারী, কঠোর ধাঁচের মানুষ ছিলেন বিনয়দা। 'বড্ড রাশভারী' গোত্রের ছিলেন। যদিও একটা সময় সম্পাদকীয়র ডিকটেশন নিতে নিতে বিনয়দার সঙ্গে সহজ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিনয়দা নিয়ম করে অফিসে আসতেন। নিজের ঘরে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসতেন। আবার ঘড়ি ধরেই উঠে যেতেন। যোগ্যতার নিরিখে বিভিন্ন দিক থেকে বিনয় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সংবাদপত্রের জন্য একজন সমৃদ্ধ মানুষ। তবে কখনও দক্ষিণারঞ্জন বসুর মত জনপ্রিয় হয়নি তাঁর কলম। তাই দক্ষিণারঞ্জন বসুর যখন 'হিরো' ইমেজ জুটেছে, তখন বিনয়দা উত্তমকুমারের পাশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত।

এমন সময়ের কথা বলছি এবারে, তখন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' সবে শুরু হয়েছে। সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মী বলতে হাতে গোনা কয়েকজন। প্রতিদিনের সংবাদ সম্পাদনা, অনুবাদ করার জন্য যত লোক দরকার, তার চেয়ে কয়েকজন কমই ছিল। কমই থাকত। আসলে সম্পাদক এবং মঞ্জুশ্রী তালুকদারের বকলমে কাগজের মালিক সুহাসচন্দ্র তালুকদার চেয়েছিলেন যত কম খরচে কাগজটাকে একটা জায়গায় দাঁড় কলানো যায়। খবরের কাগজ বের করলেই তো হল না, তার খরচ দেওয়া একটা কঠিন ব্যাপার। কাগজ বের হল, আর অমনিই হুড় হুড় করে বিজ্ঞাপন আসা শুরু হয়ে গেল, এমনটা কোনও কালেই ছিল না। এখন তো আরও-ই নেই।

যখন প্রথম প্রথম বিজ্ঞাপন জোগাড়ের কাজে বের হতাম, তখন বেশিরভাগ ২৪ টাকা বা ১৮ টাকার ছোট্ট শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে আমাদের রীতিমত হিমশিম খেতে হত। কোনও কোনও দিন এত বিরক্ত লাগত যে, কোনও বিপনিতেই আজ আর বিজ্ঞাপনের আশা নেই বুঝে ফেলতাম। তখন, এমন বহুদিন গেছে অর্ধেক দিন কিছু দোকানে বিজ্ঞাপনের জন্য ঢুঁ মারার পর ক্লান্ত/বিরক্ত হয়ে আমরা সিনেমা শোয়ে ঢুকে পড়তাম। সিনেমা দেখে মনটন ভাল করে নিতাম।

কাগজ ছাপবে, বিকোবে, প্রতিদিন ঠিক সময়ে বেরবে, বিক্রির জায়গায় ঘড়ি ধরে পৌঁছাবে অর্থাৎ স্ট্যান্ডে যাবে, এসব নানা দিক ঠিকঠাক সামাল দিতে পারলে তবেই না কাগজের দাঁড়ানো। আর সেই দাঁড়ানো যেই হতে শুরু করে কাগজ, তখন বিজ্ঞাপন হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসা শুরু হয়। কর্মখালি, পাত্রপাত্রী, রাজ্য সরকারের দরপত্র, বিদ্যুৎ পর্ষদের বিজ্ঞাপন এরকম একে একে বিজ্ঞাপন বাড়তে থাকে।

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রথম দৈনিক বলে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর বিজ্ঞাপন ভাগ্য ছিল খুবই ভাল। উত্তরবঙ্গের মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কাগজ হতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের বড় জোর দিন পনেরো লেগেছিল। প্রথম দিকে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ, বড় ধরনের কিছু ভুলত্রুটি ধরা পড়লেও উত্তরবঙ্গ সংবাদ তা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছিল। তাঁর সংবাদ যেন উত্তরবঙ্গ সংবাদে ঠাঁই পায় এরকম আশা নিয়ে শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন, একদম সাধারণ স্তরের নেতৃস্থানীয়দের ভিড়ও উত্তরবঙ্গ সংবাদে লেগেই থাকত। গৌর চক্রবর্তী, অনিল সাহা, কানাই ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, আনন্দ পাঠক, এস পি লেপচা, অরুণ মৈত্র, প্রশান্ত নন্দী, শঙ্কর মালাকার, গৌতম দেব সবার কাছেই সংবাদ প্রচারের/বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছিল পত্রিকাটি। ফলে চার-ছ' মাস বেশ আর্থিক কষ্টেসৃষ্টে চললেও কাগজটি মাটিতে পা রাখার জায়গা পেয়ে গিয়েছিল সহজেই। আমার এসব কথা একটু বিশদে লেখার কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, আমি আর গৌতমেন্দু রায় এই দু'জনে মিলে যখন প্রথম প্রথম বিজ্ঞাপন জোগাড়ের কাজে বের হতাম, তখন বেশিরভাগ ২৪ টাকা বা ১৮ টাকার ছোট্ট শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে আমাদের রীতিমত হিমশিম খেতে হত। কোনও কোনও দিন এত বিরক্ত লাগত যে, কোনও বিপনিতেই আজ আর বিজ্ঞাপনের আশা নেই বুঝে ফেলতাম। তখন, এমন বহুদিন গেছে অর্ধেক দিন কিছু দোকানে বিজ্ঞাপনের জন্য ঢুঁ মারার পর ক্লান্ত/বিরক্ত হয়ে আমরা সিনেমা শোয়ে ঢুকে পড়তাম। সিনেমা দেখে মনটন ভাল করে নিতাম। একদিন, দু'দিন নয়, বিজ্ঞাপনের প্রত্যাশায় বাজারে বেরিয়ে এরকম হয়েছে বহু দিন। সে সময় কলেজ পাড়ার তৃপ্তি দত্ত নামে এক মহিলাও বিজ্ঞাপন তোলার কাজ করতেন, তাঁর বাড়িটি ছিল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর প্রথম প্রেসের গা ঘেঁষে। আমরা বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে ব্যর্থ হলে তৃপ্তিদির বাড়িতেও ঢুকে যেতাম। সেখানে চা, কফি, আড্ডা হত। তৃপ্তিদির স্বামী আশিস দত্ত আমাদের প্রশ্রয়ই দিতেন, কোনওদিন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেননি।

সম্পাদকীয় বিভাগে লোক কম থাকা সত্ত্বেও দৈনিকে যখন সাপ্তাহিক নানা ধরনের ফিচার পেজ না করে উপায় থাকল না, তখন একসঙ্গে বহু ফিচার পেজের জন্য লেখা জোগাড়, ছবি জোগাড়, পৃষ্ঠা সম্পাদনার কাজ আমি অবিরাম করে গিয়েছি। গৌতমেন্দু রায়ও বহু করেছে। আরও যাঁরা তখন কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের লোক ছিলেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সহযোগিতা করেছেন অল্প বিস্তর। রবিবারের পাতার দায়িত্ব এ সময় আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল কিছুদিনের জন্য, আমার কিন্তু এখনও বেশ মনে পড়ে প্রথমবারই কবিতার জন্য নির্দিষ্ট অংশে অরুণেশ ঘোষের কবিতা

সস্ত্রীক লেখক

ছেপেছিলাম। হাংরি জেনারেশনের কবি হিসেবে তখন অরুণেশ ঘোষ কল্কে পেয়ে থাকেন, তবে সে কথা তো সবার জানার কথা নয়। যাই হোক দৈনিকের রবিবারের পাতায় অরুণেশের কবিতা ছেপে দিতে পারায় আমার নাম ছড়িয়েছিল বেশ। অধিকাংশ কবিতাপ্রেমী মানুষ বলেছিল, মনোজের বুকের পাটা আছে, না হলে অরুণেশ ঘোষের লেখা ছাপার এমন রিস্ক কেউ নিতে পারে। আসলে সব তো আর মনে নেই, তবে যাঁরাই একটু সম্ভ্রান্ত মানের লেখা পাঠাচ্ছিলেন, তাঁদের সবার লেখাই ছেপে দিতাম। আমার মাথার ওপর কারও কাছ থেকে অনুমতি না নিতে হওয়ায় আমি 'বিন্দাস' ভাবে করে যেতাম রবিবাসরীয় সাহিত্য-ফিচার পৃষ্ঠার সম্পাদনার কাজ। উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ির বিজ্ঞাপন বিভাগের দায়িত্ব ছিল মূল চাকরি, তার বাইরে রবিবারের পাতা, মহিলামহলের জন্য 'ঘরে বাইরে' (এখন 'শ্রীমতী') পাতা, যুবদের জন্য পৃষ্ঠা আরও কত ধরনের কাজ যে একসঙ্গে করে গিয়েছি। বাড়ি, ঘর ভুলে, আড্ডার নেশা প্রায় ত্যাগ করে নাগাড়ে কাজ করে গিয়েছি। আসলে তখন আমার যেটা মনে হয়েছিল, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' কাগজটা উত্তরবঙ্গের জন্য এক মর্যাদার কাগজ, এই কাগজ যাতে ইতিহাস রচনা করতে পারে, সেজন্য আমাদেরও উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

যশ নয়, কীর্তি নয় স্রেফ লাগামহীন ইচ্ছেকে যতটা ছন্নছাড়া করা যায় সেভাবেই এগিয়ে চলেছিলাম। শিলিগুড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার অছিলায় মামার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। উত্তরবঙ্গ সংবাদ নিয়ে যখন চূড়ান্ত মেতে উঠি, তখন মামার বাড়িও প্রায় ছেড়ে দিই। রবীন্দ্রনগরের মামার বাড়িতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত করে উঠতে পারতাম না। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অফিসে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে, অফিসের টেবিলেই শুয়ে ভোর করে দিতাম। ততক্ষণে কাগজ ছেপে জমা হতে শুরু করেছে। গিয়ে বসতাম সার্কুলেশন বিভাগের বন্টন বিভাগে। এখানে দু' চারটে কথা বলে নেওয়ার দরকার আছে, সার্কুলেশন বিভাগের আলাদা লোক থাকা সত্ত্বেও কেন আমি গিয়ে বসতাম সার্কুলেশন বিভাগের কাগজ বন্টনে। মূল কারণ, প্রথমে ফ্ল্যাট মেশিনে কাগজ ছাপা হত। সেই কাগজ ছাপতে প্রতিদিন দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা করে দেরি হত। আর দেরি হলেই হকারদের মাথা সব বিগড়ে যেত। যে ওই বন্টন বিভাগের দায়িত্বে থাকত, তাকে মা, মাসী, বাবা তুলে গালিগালাজ করত। আর সেইসব গালিগালাজ শোনার পর কোনও কর্মীরই ওই বন্টন বিভাগে বসার ইচ্ছে হত না। অথচ

সার্কুলেশন বিভাগের আলাদা লোক থাকা সত্ত্বেও কেন আমি গিয়ে বসতাম সার্কুলেশন বিভাগের কাগজ বন্টনে? মূল কারণ, প্রথমে ফ্ল্যাট মেশিনে কাগজ ছাপা হত। সেই কাগজ ছাপতে প্রতিদিন দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা করে দেরি হত। আর দেরি হলেই হকারদের মাথা সব বিগড়ে যেত। যে ওই বন্টন বিভাগের দায়িত্বে থাকত, তাকে মা, মাসী, বাবা তুলে গালিগালাজ করত। আর সেইসব গালিগালাজ শোনার পর কোনও কর্মীরই ওই বন্টন বিভাগে বসার ইচ্ছে হত না।

কাজটার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। যেমন ১৫০-২০০-৬০০-৮০০ কাগজ গুণে দেওয়ানোর পাশাপাশি কার্ডে তা এন্ট্রি করা, কমিশন বাদ দিয়ে দাম বুঝে নেওয়া। আগের দিনের দু-পাঁচ টাকা বাকি থাকলে সেই হিসেবও বুঝে নেওয়া। এভাবে শ'খানেকের বেশি কাগজ বিক্রেতাকে সামাল দিতে এমনিতেই ল্যাজেগোবরে হতে হত সবাইকে। আর যেদিন যেদিন কাগজ লোডশেডিঙের কারণে বা মাঝ রাতে লেটার প্রেসে ম্যাটার ভেঙে যাওয়ার কারণে দেরি হত, সেদিন সেদিন আর উপায় থাকত না কিছু। মুখ বুজে গালি হজম তো করতেই হত, তাতেও শেষ রক্ষা করা ছিল খুবই মুশকিলের। কারণ, আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথম ৬-৮ মাসের একটা বড় পর্ব মাসের ৩০ দিনের মধ্যে ২৮ দিনই এভাবে কাটত। হকারদের পাল্টা কিছু বলা যাবে না! ওঁদের 'ঐক্য' ছিল সাঙ্ঘাতিক। ওঁদের বিরুদ্ধে কিছু বললে, সবাই মিলে সব কাগজ নামিয়ে রেখে দিত। বলত, আমরা কাগজ বন্টন করব না। থাকবে কাগজ এমন ঘরেই পড়ে। এত কষ্ট করে 'কাগজ' ছাপার পর সেই 'কাগজ' পড়ে থাকবে, তা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারতাম না। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি হলে যেমন হয়, আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বুঝি— উত্তরবঙ্গ সংবাদের আমি মালিক ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু নিজে হাতে যে গাছের বীজ মাটিতে পুঁতে ছিলাম, সেই গাছের ডালপালা কেউ ছেঁটে দেবে, তা মন থেকে মেনে নেওয়ার মত অবস্থায় ছিলাম না। কাগজটাকে নিজের কাগজ ভাবতাম। কাগজের সঙ্গে নিজের মান-সম্মান এতটাই জড়িত হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তখন অন্য চাকরির জন্য সরে আসার ভাবনাও ভাবতে পারতাম না। মনে হত, উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।

অথচ এই উত্তরবঙ্গ সংবাদ কিন্তু প্রকৃত অর্থেই আমাকে রিপোর্টারের চাকরি দেয়নি। গৌতমেন্দু রায়কেও না। পরে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছেড়ে অন্য কাগজে যোগ দিয়ে, সেইসব কাগজে থাকাকালীন উত্তরবঙ্গ সংবাদে বহু স্পেশাল আইটেম রিপোর্ট করেছি। বহু এক্সক্লুসিভ আইটেম রিপোর্ট করেছি। শুধু একের পর এক লাগাতার রবিবার-এর কভার স্টোরি করে গিয়েছি। বইপত্রের সমালোচনা করেছি। ডাক্তারি লিখেছি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, প্রতি শনিবার টানা দশ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদের শনিবারের 'সুস্থ থাকুন' পাতা সম্পাদনা করে গিয়েছি। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে, ডাক্তারদের ইন্টারভিউ নিয়ে সেসব সম্পাদনা করে ছেপেছি। 'সুস্থ থাকুন' পাতাটি আমি নাকি এতটাই জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিলাম, সম্পাদক সুহাস তালুকদার নিজমুখে আমাকে শোনাতেন— তোমার এই শনিবারের 'সুস্থ থাকুন' পাতা পত্রিকার থেকে বের করে নিয়ে আলাদা ব্ল্যাকে বিক্রি করা হয় কোথাও কোথাও। বাসে, ট্রেনে সর্বত্র শনিবার খবরের কাগজ পড়ুয়ার হাতে 'শনিবাসর' পাতাটি ব্যাপক হারে শোভা পেত। উত্তরবঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় বসে অন্য কাগজের চাকরির পাশাপাশি যখন উত্তরবঙ্গ সংবাদের 'সুস্থ থাকুন' সম্পাদনা করছি, তখন প্রায় প্রতি মাসেই উত্তরবঙ্গে যেতাম। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ইসলামপুর— যেখানে গিয়েছি, দেখেছি সত্যিই শনিবাসর, সুস্থ থাকুন যেন অতুলনীয়। এত জনপ্রিয়তা পেতে পারে একটি কাগজের ফিচার পাতা আমি নিজে না দেখলে কোনওদিনই হয়ত বিশ্বাস করতাম না।

আমি ডাক্তারি পড়তে পারিনি। যদিও 'সুস্থ থাকুন' পাতাটি সম্পাদনা করতে গিয়ে ডাক্তারি থেকে পুষ্টি বিজ্ঞানের পড়াশোনা আমাকে নিরন্তর করে যেতে হয়েছে। ডাক্তারদের সঙ্গে ওঠাবসায়, তাঁদের দেওয়া ইংরেজি বই এবং ইন্টারনেটের রেফারেন্স পড়তে পড়তে সব মিলিয়ে একসময় আমার মনে হতে লাগল, এবার আমি 'সিওর' ডাক্তার হয়ে যাব। আসলে এ সময়টায় আমি নিজের উদ্যোগেও ডাক্তারি বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করছিলাম, করে ফেলেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তারির বিষয়ের মধ্যে এত কিছু জানার থাকতে পারে, আগে কোনওদিনও আমার মনে হয়নি। আর পুষ্টি-পরিচয়ের ক্ষেত্রে ডাক্তাররাও যে অনেকটাই পিছিয়ে তাও আবিষ্কার করি। আজকের 'সুস্থ থাকুন' পাতা, রবিবারের কভার স্টোরির পাতা, মেয়েদের পাতা— এরকম নানা ফিচার পাতা সম্পাদনার ভার আমার হাতে কার্যত জোর করে তুলে দিয়েছিলেন সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্বয়ং। এটা প্রথম দিককার কথা বলছি না। বলছি, তখনকার কথা, যখন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' চার পায়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে। কিন্তু সম্পাদককে সব সময় মাথায় রাখতে হচ্ছে, কলকাতার কাগজগুলো সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে নানা ধরনের ফিচারের পাতা দিতে শুরু করেছে। অতএব উত্তরবঙ্গ সংবাদ যদি না দৌড়য়, তাহলে সে তো পিছিয়ে পড়বে, তাই কলকাতার কাগজগুলো যত ধরনের ফিচারের পাতা ভাবল বা দিল, সুহাস তালুকদারও ততগুলো ভাবলেন। দিলেনও।

(ক্রমশ)

এই রচনা প্রতিবেদকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অভিমত, এর নৈতিক ও আইনি দায় তাঁর, কোনওভাবেই 'এখন ডুয়ার্স'-এর নয়।

কোচবিহার তার ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ঐতিহ্য রক্ষায় কতটা সক্ষম ?

কোচবিহারের কড়চা

অভিজিৎ দাশ

কোচবিহার অন্য যে কোনও শহরের চাইতে যে একটু অন্যরকম ছিল তা স্যার আশুতোষও বলেছেন, লিখেছেন। সাহিত্যসভার অতিথিদের মন্তব্যের খাতা (যদি এখনও অটুট থাকে) খুললে এ শহর সম্বন্ধে বিজ্ঞজনের মনোভাব জানা যাবে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই থেকে COB বলতে City Of Beauty হয়ে গিয়েছিল কোচবিহার। নীরজ বিশ্বাস বলেছেন তাঁর 'সবই ছিল যার অন্যরকম' নিবন্ধে। আবার 'কোচবিহার ভীতি, না অবহেলা?' শীর্ষক লেখায় তিনি স্মরণ করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতার পংক্তি— 'যাবেন যদি কুচবিহার, পাবেন নাকো কুচভি আর।'

আমরা অনেকেই জানি, কোচবিহারের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ। ঐতিহাসিক স্বপনকুমার রায় তাঁর 'কোচবিহারের ইতিহাস অনুসন্ধান ও প্রত্নসংরক্ষণ প্রচেষ্টা' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে আয়োজিত এক সভায় সভাপতি হিসেবে ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন "...আপনারা সকলেই জানেন যে কোচবিহার রাজ্য বহু পুরাতন, এবং যদিও এখন এই রাজ্যের আকৃতি ছোট, এককালে ইহা বহু দেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজা ও শ্রীশ্রীমহারাণীর অনুমতি লইয়া আমি রাজ্যে কোচবিহার সাহিত্যসভা নামে একটি সভা গঠন করিতে ইচ্ছা করি। এখনও বহু পুরাতন পুঁথি, প্রাচীন মন্দির, দুর্গাদির নিদর্শন, মুদ্রা ইত্যাদি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত ৫০ বছরে অনেক পুঁথি, মুদ্রা ইত্যাদি এই রাজ্য হতে অপসৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে রাজ্যস্থ ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি কিছুতেই অপসৃত হইতে দেওয়া যাইবে না। এই উদ্দেশ্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি যত্নসহকারে সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে। ভদ্রোমহোদয়গণের প্রদত্ত দ্রব্যাদিও ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে।" এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় কোচবিহার সাহিত্যসভা। বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে এই সভার সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। মহারাজা নরনারায়ণ থেকে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নারায়ণী মুদ্রা এমনকি ভারতের আদিমুদ্রাও এই প্রতিষ্ঠানে ছিল। কোচবিহার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত কামান ও তরবারির লিপির পাঠোদ্ধারের কাজ এবং সারস্বত চর্চার জন্য মহারাজা নিজে উদ্যোগী হয়ে জামনগর ও জয়পুর রাজ্যের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেছিলেন। মহারানি নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যসভা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচারিকা নবপর্য্যায়' পত্রিকা। প্রবাসী পত্রিকার পাতায় কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলীর (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড) সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। 'সুকথা', 'পরিচারিকা', 'কোচবিহার দর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকা কিংবা রাজানুকুল্যে প্রকাশিত বইগুলি এখন বেশিরভাগই কোচবিহারে নেই। কোচবিহার সাহিত্য সভা সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকা প্রকাশ, পুথির ক্যাটালগ তৈরির কাজ

কোচবিহার পর্যটকদের কাছে লোভনীয় গন্তব্য হতে পারত, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু কেন? পেশাদারি মানসিকতার অভাব, আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে উদাসীনতাই কি এর কারণ? কোচবিহারের উন্নতিতে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনার সময় বোধহয় এসেছে। কোচবিহারকে হেরিটেজ টাউনের তকমা দিতে বর্তমান সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। সমীক্ষাপর্ব শুরু হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের ফলাফল বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন অনেকেই। অতীতের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুখকর নয় বলেই জানিয়েছেন কোচবিহারের সঙ্গে জড়িত প্রবীণ ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে প্রতিশ্রুতি আর রূপায়নের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক থাকে।

পুনরায় শুরু করলেও দীর্ঘদিনের অব্যবস্থার মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বহু মূল্যবান উপাদান।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে লক্ষাধিক বই সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। স্বল্প সংখ্যক কর্মীর মাধ্যমে সুবিশাল গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন বহু গবেষক। অন্ধকার ঘরে নষ্ট হচ্ছে দেশ বিদেশের মহামূল্যবান বই। হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর 'The Cooch Behar State and Its Land Revenue Settlement' থেকে জানতে পারি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল হটনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছিল 'কুচবিহার স্টেট লাইব্রেরী'। প্রাথমিক অবস্থায় ইংল্যান্ডের মেসার্স রজারিও অ্যান্ড কোম্পানির থেকে নিলামে বেশ কিছু মূল্যবান বই কেনা হয়েছিল। অথচ আজ সে লাইবেরির অবস্থা ভাবলে দুঃখ হয়। হতাশ লাগে। বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি— কোচবিহারের ইতিহাসের সূত্রে আরেকবার কথাটি সত্যি বলে মনে হয়।

বাংলায় আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চা শুরু হয়েছিল কোচবিহারেই, মুন্সী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান' (১৮৪৫) রচনার মধ্য দিয়ে। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মহারানি বৃন্দেশ্বরী দেবী লিখিত 'বেহারোদন্ত' বইটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি দ্বারা লিখিত ইতিহাস শুধু নয়, নারীর লেখা প্রথম মুদ্রিত পুস্তক; কোচবিহারের প্রথম মুদ্রিত ইতিহাসও বটে। অবশ্য প্রস্তুতিপর্ব চলছিল অনেকদিন থেকেই। ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের চিঠিটি বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ইতিহাস যদি ইতিহাস লেখার ইতিহাস হয়, তবে কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্য যে কাব্যে উপেক্ষিত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অমিয়ভূষণ মজুমদার বলছেন— "আমরা তেমন ইতিহাস লিখিনি, অথবা লিখতে শিখিনি বলেই ভাষা ও সাহিত্য ইতিহাসে লজিককে স্থান দিতে পারি না। নতুবা রাঢ়ের কৃষ্ণকীর্তন, ময়মনসিংহগীতিকাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দিয়ে, কামতার শঙ্করদেব, অনন্ত কন্দলী, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখকে বাইরে রাখা কঠিন হত।" তাঁর লেখা 'প্রাচীন কোচবিহারের ভাষা এবং সংস্কৃতি', 'প্রাচীন কোচবিহার ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা' কিংবা 'কোচবিহার সম্বন্ধে' প্রবন্ধ থেকে 'আমাদের ইতিহাস'কে চিনে নেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে। সে ইতিহাসে কোচবিহার স্বয়ং এক কেন্দ্র। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা চন্দনের সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে বিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। প্রায় ৪৪০ বছর সময়পর্বে ২৫৭ বছর এই রাজ্য স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রেখেছিল। উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন পেয়েছিল লোকজীবনের সঙ্গে অন্বিত থাকার সূত্রেই। এবং লাভ করেছিল অনন্য চরিত্র। কোচবিহারের ইতিহাস কিংবা ঐতিহ্যের আলোচনায় এই স্বাধীনতাকামী অবস্থানটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কোচবিহারের ইতিহাস একপ্রকার লেখা হয়নি বললেই চলে। এর সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে? ইতিহাস রচনার জন্য সময়ের দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা? নাকি অনভিপ্রেত এমন কিছু বিষয় থেকে দূরে রাখার চেষ্টা নিজেদের যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত রুটি-রুজি নিরাপত্তার প্রসঙ্গ? আমরা যারা আশির শেষ বা নব্বই-এর দশকে জন্মেছি, আকর্ষিত হয়েছি কোচবিহারের ইতিহাসের প্রতি; বারেবারে অবাক হয়েছি এই কথা ভেবে যে এত বড় রাজপ্রাসাদের এত কিছু সম্পত্তি কীভাবে লুঠ হয়ে গেল! ১৯৮২ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কোচবিহার রাজপ্রাসাদ সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করবার আগেই যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। জানিনা রাজসম্পদের বহির্গমনের রহস্য কোনওদিন উদ্‌ঘাটিত হবে কিনা।

কোচবিহার পর্যটকদের কাছে লোভনীয় গন্তব্য হতে পারত, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু কেন? পেশাদারি মানসিকতার অভাব, আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে উদাসীনতাই কি এর কারণ? কোচবিহারের উন্নতিতে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট

সরকারের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনার সময় বোধহয় এসেছে। কোচবিহারকে হেরিটেজ টাউনের তকমা দিতে বর্তমান সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। সমীক্ষাপর্ব শুরু হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের ফলাফল বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন অনেকেই। অতীতের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুখকর নয় বলেই জানিয়েছেন কোচবিহারের সঙ্গে জড়িত প্রবীণ ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে প্রতিশ্রুতি আর রূপায়নের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক থাকে। এই সূত্রেই বলতে হয় কোচবিহারের বিভিন্ন হেরিটেজ বিল্ডিংগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও। নীলকুঠি রাজবাড়ি ধংস হয়ে গেছে। মহারাজাদের গোলাবারুদ রাখার তোপখানার ভগ্নপ্রায় দশা। টেম্পল স্ট্রিটের সাবিত্রী লজ সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন। এই বাড়িতেই থাকতেন কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও কেশব সেনের কন্যা সাবিত্রী দেবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। রাজআমলের বিভিন্ন বাংলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। হলদিবাড়ির পুরনো হাসপাতাল বিল্ডিংটিও বিলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে।

সাবিত্রী লজ

কোনও একটি হেরিটেজ বিল্ডিং- কে অটুট রাখা মানে এর অনুষঙ্গে ইতিহাস ও মানুষের বেঁচে থাকা। ভূগোল হারিয়ে গেলে ইতিহাস মুছে যেতে যে বেশি সময় লাগে না, তা নতুন করে না বললেও চলে।

রাজন্যবর্গের পরিকল্পনায় গড়ে ওঠা একটি শহরকে কেবলমাত্র সঠিক রক্ষণাবেক্ষণই করা সম্ভব হল না স্বাধীন ভারতে। একটি রাজ্যে যা যা থাকবার কথা, সব ছিল। আমাদের অপদার্থতায় সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। তা সে প্লেন চলাচল হোক কিংবা সংস্কৃত কলেজ। রাস্তার বাতি, ফলক, রাজবাড়ির রেলিং সব কিছুই চরম অবহেলার শিকার। দোতলা বাসের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোচবিহার দিঘির শহর বলে পরিচিত। অনেক জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। জলদূষণের কথা আর নাই বা বললাম। নিকাশি ব্যবস্থার এমন বেহাল দশা রাজ আমলে ছিল না। আমাদের তথাকথিত উন্নয়নের পরিকল্পনা কতটা বাস্তবমুখী ও ঐতিহ্য অনুসারী? কিছুদিন আগে কোচবিহার স্টেশন চৌপথির কাছে তল্লীগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। নাগরিক আন্দোলনের ফলেই গাছ কাটার প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত আছে। ইতিহাসের পাতা থেকে দেখছিলাম, ১৮৭৮-৭৯ সালে ভুটান ফরেস্ট থেকে নীলকুঠির পাশে এক হাজার শাল গাছ লাগানো হয়েছিল। ১৮৭৪-৭৫ সাল নাগাদ মাত্র দু-বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে বারো মাইল রাস্তার পাশে শিশু গাছ লাগানোর সংবাদ পাই আমরা। আজ শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলিকে উন্নয়নের নামে অবলীলায় কেটে ফেলা হচ্ছে। রাস্তার পাশে রাজ আমলের জলের কল অবহেলায়, অযত্নে হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির আড়ালে। উন্নয়ন আর উচ্ছেদের গল্পের মধ্যে ধূসর জায়গা জুড়ে শুধুই অতীতের স্মৃতি।

অবশ্য রাজ আমলের স্মৃতিচারণ করবার মত মানুষেরাও যে প্রায় নেই হয়ে যাচ্ছেন। রাজপ্রতিনিধির মর্যাদাপ্রাপ্ত অমিয়কুমার দেববক্সীর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শেষ হল একটি অধ্যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, কোচবিহারের স্থানীয় বাসিন্দা যারা রাজপরিবার কিংবা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যারা কর্মসূত্রে রাজনগরে এসেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে তৈরি হতে পারত এক অন্য ইতিহাসের খোঁজ। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মৌখিক ইতিহাস বড় আকারে লিপিবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা বিরল। পারিবারিক নথিপত্রের খোঁজ এবং সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। কোচবিহারের প্রথম নারী স্নাতক ইন্দিরা রায়ের নাতি আশিস রায় যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর পূর্বসূরীদের বহু ছবি, চিঠি, মুদ্রা ও অন্যান্য পুরাতাত্ত্বিক উপাদান। তাঁর মতে "পুরোনো পরিবারগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণের ইচ্ছে থাকলেও অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আর্থিক সঙ্গতিও এর প্রধান কারণ। সরকারি উদ্যোগ বেশিরভাগ কাগজে কলমে আবদ্ধ হয়ে আছে। কোচবিহারের পুরাতাত্ত্বিক উপাদান সংরক্ষণের উন্নতমানের ব্যবস্থা হলে আমরা সবাই খুশি হব।"

আশার কথা, নবীন প্রজন্ম কোচবিহারের ঐতিহ্যের বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। কুচবিহার আর্কাইভ ও কোবওয়েব সংস্থাদুটির নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোচবিহারের বিভিন্ন হেরিটেজ বিল্ডিংগুলি ভেঙে ফেলার বিষয়ে ধারাবাহিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে কুচবিহার আর্কাইভ। ক্যুইজপ্রেমীদের সংগঠন কোবওয়েব কোচবিহারের আঞ্চলিক ইতিহাসের ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব ও পড়াশুনোর ব্যাপারে উৎসাহী করছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে। কোচবিহার ন্যাস গ্রুপ পরিবেশবাদী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটি প্রায় এক দশক ধরে কাজ করছেন। রেল মিউজিয়াম ও পি ডব্লিউ ডি মিউজিয়াম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রয়েছে। কোচবিহারে একটি মুদ্রা গ্যালারি গড়ে তোলা খুব জরুরি। প্রয়োজন লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি। আমরা জানি উত্তরবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম লিটল ম্যাগাজিন পথ চলা শুরু করে এই জেলাতেই। মুশকিল হল, করতে হবে বললেই তো আর হবে না, করবে কে?

ছবির মত সুন্দর একটি শহর কালে কালে হয়ে উঠল ধূলিধূসরিত। জনবসতির চাপে ক্লিষ্ট হওয়াই যেন ছিল এর অনিবার্য নিয়তি। রাজপ্রাসাদের চেয়ে উঁচু ইমারত গড়ে না তোলবার মনটুকু হারিয়ে গেছে আজ। নগরের আত্মার কান্না শোনার মতো ফুরসত আছে আমাদের? আমরা কি ধরেই নিয়েছি প্রতিদিন ক্ষয়ে যেতে থাকা রাজকীয় আভিজাত্য ও উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের উত্তরাধিকার বহন করতে পারব না আমরা? কিংবা অন্যভাবে যদি বলি, আমরা কি আদৌ সক্ষম কোচবিহারের ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব কিংবা ঐতিহ্য রক্ষায়?

দেবায়ন চৌধুরী

দিনাজপুরের দিনকাল

বিঘোরের বেগুন

শীতের মরসুম শুরু হতে না হতেই ভোজন রসিক বাঙালির রসনাতৃপ্তি করতে বাজারে হাজির উত্তর দিনাজপুরের ছোট বড় বাজারে এরই মধ্যে হাজির বিঘোরের বেগুন। গরম ভাতের সাথে বেগুনের রকমারি পদ শীতকালে বাঙালির পছন্দের তালিকায় প্রথম সারিতে থাকে বৈকি! তাহলে বিঘোরের বেগুন কী তা ভাবছেন নিশ্চই? কেমনই বা হয় এটি দেখতে? এটা জেনে হয়তো অনেকেই অবাক হবেন, বিঘোরের এই বেগুন ওজনে একাই এক কেজি-র ওপর হয়। সেটাও এই মরশুমের শুরুতে। মরসুমে আরও স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে এই বেগুন। সুদৃশ্য, সবুজ ও মসৃণ এই বেগুন আপাতত কিছুটা চড়া দামে বিকোলেও আগামী কিছু দিনের মধ্যে দাম কিছুটা কমবে বলে আশা সকলের। যদিও চড়া দামের তোয়াক্কা না করে সকাল সকাল ব্যাগ হাতে এই বিশেষ এই প্রজাতির বেগুন কিনতে ভিড় উপচে পড়ছে বাজারে। বিক্রেতারা জানান, এখন এই বেগুনের ওজন একেকটির প্রায় ৫০০ গ্রাম থেকে এক কেজির মধ্যে। কিছুদিন পরই এগুলির আকার এক সোয়া কেজি, এমনকি দেড় কেজি পর্যন্ত হয়ে যাবে।

স্বাদেও অতুলনীয় এই বেগুন। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের ৮ নম্বর বাহিন গ্রামপঞ্চায়েত লাগোয়া বিহার রাজ্যের কাটিহার জেলা। এখানকার বারসই থানার বিঘোর হাটে এই বিশেষ ধরনের বেগুনের ফলন হয়। এরপর কাচনা স্টেশন থেকে রায়গঞ্জের বিভিন্ন বাজারে পাঠানো হয় এই সুস্বাদু বেগুন। কিন্তু কেন এই বিঘোর এলাকার বেগুন এই ধরনের হয় তা নিয়ে কৌতুহলী অনেকেই। বারসই থানার অন্তর্গত বিঘোর হাট এলাকা- যার নাম থেকেই এই বিশেষ প্রজাতির বেগুনের নাম রাখা হয়েছে। শীতকালের খাবার পাতে বা চড়ুইভাতিতে - এই বিঘোরের বেগুন মন ভরায় সকলের। তা সে ভর্তা রূপে আসুক বা সাদামাটা বেগুন ভাজা - বিঘোরের বেগুনের জুড়ি মেলা ভার। উত্তর দিনাজপুর জেলার গর্ব, স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় তুলাইপাঞ্জি চালের গরম ভাত ও বিঘোরের বেগুনের জুটি এই মরসুমের সেরা। অন্য কোথাও এই বেগুন সেভাবে না মিললেও দুঃখ কি! শীতকালে এ জেলায় ঘুরতে আসা মানুষ ও আত্মীয় পরিজনদের বাড়ি ফেরার সঙ্গী অবশ্যই বিঘোরের বেগুন। বাজার থেকে বড় মাপের বেশ কয়েকটি বেগুন ভিন জেলার মানুষেরা সঙ্গে করে নিয়ে যান তাদের বাড়ি। তাই এই মরসুমে রসনা লোলুপ বাঙালির উপহার হয়ে ওঠে এই বিঘোরের বেগুন।

জানা গেছে, মৃত্তিকা ও পরিবেশ ও অনুকূল আবহাওয়া এমন সুদৃশ্য ও সুস্বাদু বেগুনের মূল রসদ। উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী বিহারের বিঘোর হাট এলাকার হলেও, উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদর রায়গঞ্জ শহরেই মূলত পাওয়া যায় এই বেগুন। বিঘোর হাটের সবচেয়ে

কাছের শহর রায়গঞ্জ। এখান থেকেই মালদা, ফারাক্কা, বহরমপুর, শিলিগুড়ি,বালুরঘাটে পাড়ি দেয় এই বিঘোরের বেগুন। উত্তর দিনাজপুরের জেলা উদ্যানপালন আধিকারিক দীপক সরকার জানান, মাটির গুণগতমান ও আবহাওয়ার কারণেই বহু বছর ধরে উত্তর দিনাজপুর জেলার পার্শ্ববর্তী বিঘোর এলাকায় বড় মাপের এই বেগুনের ফলন হয়ে থাকে। আবহাওয়া ও মাটির চরিত্রগত মিল থাকায় রায়গঞ্জ ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় এই বেগুনের চাষ করা হলেও বিঘোরের মত বড় আকৃতির হয় না। তবে এই ব্লকের গৌরী, বাহিনের দুবদুয়ার, টেগরা, ভিটিহার, কুমারজোল প্রভৃতি এলাকার এই বেগুনের ফলন হয়।

রায়গঞ্জের মোহন বাটি, কলেজপাড়া, লাইন বাজার, দেবীনগর বাজার, রাসবিহারি মার্কেট, এফ সি আই মোড়, গোশালা বাজারসহ সব বাজারেই এখন এই বেগুন নিয়ে বসেছেন সবজি বিক্রেতারা। বিক্রেতারা জানান, মরসুমের শুরুতেই আমরা বাজারে এই বেগুন নিয়ে এসেছি। এতে করে ভাল দাম মেলে। বর্তমানে এই বিঘোরের বেগুনের বাজার মূল্য ৪০ থেকে ৫০ টাকা প্রতি কেজি। এক বিঘা জমিতে এই বেগুন চাষ করতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। ভাদ্র মাসে এর বীজ বোনা হয়। প্রায় তিন মাস পর এর ফলন হয়। প্রতি বিঘা থেকে ৭০ থেকে ৮০ কুইন্টাল বেগুন পাওয়া যায়। যার বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এই চাষ পর পর দু'বছর একই জমিতে করা হলে তার পরেরবার ফলন হয় না। সেইক্ষেত্রে আবার ধান, পাট, গম সহ অন্য কোনও ফসল চাষ করতে হয়। এরপর আবার ওই জমিতে এই বেগুনের চাষ করা হয়।

রায়গঞ্জের ভিটিহার এলাকার বেগুন চাষিরা জানান, এই মরসুমে তারা বেশ কয়েক বিঘা জমি জুড়ে এই বেগুন লাগিয়েছেন। যদিও কিছুদিন পর এর দাম অনেকটাই কমে যাবে। সেসময় একটু লাভের আশায় এগুলো নিয়ে অন্য জেলায় গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যান তারা। এই বেগুনের বীজ সংগ্রহ হয় বাগানেরই পাকা বেগুন থেকে। এই বীজ সংগ্রহ করে তা বোতল বন্দি করে রাখতে হয় পরের বছরের জন্য। চাষ করার জন্য এই বীজ অন্য কোনও জায়গায় লাগালেও কোন লাভ নেই। বিঘোর হাট ও তার আশেপাশের এলাকার বিশেষ ধরনের মাটি ও পরিবেশের জন্যই এই জাতীয় বেগুন উৎপাদিত হয়। তাই সুস্বাদু এই বেগুনের অতুলনীয় স্বাদ পেতে হলে এই মরসুমে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে আসা যেতেই পারে।

অপরাজিতা জোয়ারদার

বইমেলায় বইপ্রেমীরা কই ?

শিলিগুড়ি ডায়েরি

নামটাও তো গালভরা— উত্তরবঙ্গ বইমেলা ! গোটা উত্তর বাংলার প্রেস্টিজ রক্ষার দায় তো বর্তায় এই মেলার ওপরেই, তাই না ? অথচ অংশগ্রহণকারী প্রকাশকেরাই অনেকেই হতাশ, বলছেন, উত্তরবঙ্গ বইমেলায় প্রকাশনী স্টলের সংখ্যা প্রত্যেক বছর কমছে! কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বা মালদা'র জেলা বইমেলায় বইয়ের স্টল বা লোক সমাগম অনেক বেশি ! কী দরকার শিলিগুড়িতে দুটো বইমেলা করবার ?

শীতের সঙ্গে মাঠের একটা মিষ্টি সম্পর্ক আছে। যদিও ক্যালেন্ডারের পাতায় এখন হেমন্ত— নবান্নের কাল। তবু ভাইফোঁটা পর্ব মিটে গেলেই আমরা 'শীত' বলে ডাকি সময়কে। শিশিরে স্নান করে কমলালেবু-রঙা রোদ মেখে মাঠ হয়ে ওঠে সুন্দরী। আহা ! তার কমলা বাহারে মন্ত্রমুগ্ধ মানুষ ভিড় জমায়। পা ছড়িয়ে বসে একটু রোদ মেখে নেওয়া অথবা হাত-পা ছুঁড়ে একটু ব্যায়াম ব্যায়াম খেলা। আর ছোটর দল তো মাঠ পেলেই ব্যাট হাতে বল পেটাতে থাকে। আমার শহরের বুক আলো করে জেগে থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন। বরং বলা যায় শীতে তার ফুরসৎ নেই। কতটুকুই বা ঘুমোতে পারে সে ! সবুজ ঘাসের পরিচর্যা হয় যথাযথ, খেলার মাঠে খেলাও চলতে থাকে নিজস্ব সূচী মেনে। তার পাশাপাশি জমে ওঠে মেলা। অগ্রহায়নের প্রথম সপ্তাহ না পেরোতেই মেলা বই নিয়ে ভীড় জমায় কিছু প্রকাশনা-সংস্থা। সারি সারি খোপ তৈরি হল— পোশাকী নাম স্টল। স্টল কিনলেন ছোট-বড় প্রকাশনা-সংস্থা। সামান্য খরচে টেবিল আর জায়গা পেল লিটলম্যাগাজিনগুলি। বেশ হৈ হৈ ব্যাপার। মেলার মাঠে চলছে গান,আড্ডা। স্টেজ জুড়ে নানা অনুষ্ঠান। পত্রিকা প্রকাশ। ফুডস্টলগুলোর ভাল উপার্জন। বেঞ্চ আলো করে আছেন খাইয়েরা। নানা কিসিমের খাবার নানা কিসিমের আচার —আহা ! বই দেখতে দেখতে পরিশ্রম পেলেই চট করে ঘুরে যাওয়া ফুডকর্ণারে।

মেলা মানেই লোক। লোক দেখব, ভিড় দেখব বলে মেলায় আসি। বসে থাকি বন্ধুদের স্টলে। এবার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। শেষবেলায় লোকজন কিছু আসে বটে, মেলায় ঘোরার মত আনমনে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যায় কোনও স্টলে, কেনে অথবা শুধুই ঘাঁটাঘাঁটি। কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোনও বই কিনবে বলে এসে বেছে নেয় খুঁজে নেয় সেসব ! কিন্তু মেলা তেমন জমে ওঠে না। আচ্ছা যদি প্রবেশ মূল্য কমিয়ে দেওয়া যেত পাঁচগুণ তাহলে হয়ত চার সদস্যের যে পরিবারটির শনি ও রবি দুটো দিন আসার ইচ্ছে ছিল তারা আসতে পারত। আরও কিছু বই বিক্রি হতে পারত। কিশোরীদের যে দলটি ভেবেছিল কোচিং সেরে একবার ঢুঁ মারবে তারাও বইয়ের স্বাদে আরেকদিন আসত। সদস্য সংখ্যা পাঁচ হলে গেটেই চলে যায় পঞ্চাশ ! মেলা করতে খরচ অনেক জানি, কিন্তু বইমেলার উদ্দেশ্য তো বইয়ের বিক্রি বাড়ানো তাই না ? সারা বছর প্রকাশকরা এই বইমেলার দিকেই তাকিয়ে থাকেন ! আর নামটাও তো গালভরা— উত্তরবঙ্গ বইমেলা ! গোটা উত্তর বাংলার প্রেস্টিজ রক্ষার দায় তো বর্তায় এই মেলার ওপরেই, তাই না ? অথচ অংশগ্রহণকারী প্রকাশকেরাই অনেকেই হতাশ, বলছেন, উত্তরবঙ্গ বইমেলায় প্রকাশনী স্টলের সংখ্যা প্রত্যেক বছর কমছে ! কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বা মালদা'র জেলা বইমেলায় বইয়ের স্টল বা লোক সমাগম অনেক বেশি ! কী দরকার শিলিগুড়িতে দুটো বইমেলা করবার ? কলকাতা বইমেলায় এন্ট্রি বিনামূল্যে অথচ এখানে কেন দশ টাকা সে প্রশ্ন প্রায় সবারই। এই শহরের বাসিন্দা হিসেবে এসব কথা শুনতে আদৌ কি ভাল লাগে কারও ?

পথে পরিচিত কিছু মুখ , দেখা হওয়াতে জিজ্ঞাসা করলাম —গেছিলে ? বইমেলায় ? জবাব এল ছোটটার ৩ তারিখে আর বড়টার ৮ তারিখে শেষ হবে। কী করে যাব বল ? ওদের জন্যই তো যাওয়া ! সত্যিই তো যদি সময়টা পিছিয়ে যেত আর কয়েকটা দিন তাহলে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার্থীরা সুস্থ একটা শ্বাস ফেলে ঘুরতে পারত কিনতে পারত তাদের পছন্দের বই। বইমেলা কমিটি এদিকগুলো একটু বিবেচনা করতে পারেন।

বরং অন্যান্য দেখি মেলায় ভীড় থিকথিক করে। এই ক্রীড়াঙ্গন তো এ সময় মেলার অঙ্গন হয়েওঠে। শিল্পমেলা খাদ্যমেলা চর্ম-মেলা চলতে থাকে একটার পর একটা। স্টেডিয়ামের গা-ঘেঁষা রাস্তাটি ভিড়ের দখলে চলে যায়। কই ! বইমেলায় তেমন তো চোখে পড়ে না ! অথচ প্রত্যেকবার স্টলের মূল্যবৃদ্ধি হয়। বইয়ের সাথে অন্যান্য উপকরণ সাজিয়ে বসে, নইলে স্টল যে খালি পড়ে থাকে ! এতে উদ্যোক্তাদের ঘাটতি পুষিয়ে যায় হয়তো বা কিন্তু বইমেলার উদ্দেশ্যও তো হারাতে থাকে।

মনে রাখতে হবে, বইমেলায় হিরো কিন্তু বই !

শ্যামলী সেনগুপ্ত

রাসায়নিক রস

স্বদেশী অদ্বৈত ভাট

নমস্কার! আপনারা আমাকে অদ্বৈতবাদের ওপর আলোচনা করতে বলেছেন। বিলিতি বিষয় ছেড়ে দিশি বিষয় নিয়ে আগ্রহ দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। গান্ধিজী বলেছিলেন, বিলিতি বর্জন করতে। পাওয়ারে তো আমরাই আসছি। 'ইদ' শব্দটার মধ্যে বিদেশি গন্ধ আছে। আমরা ওটাকে 'ইদং' করে দেব।

অদ্বৈতবাদ মানে এক। একা। বিরোধি থাকলেই সেটা দ্বৈতবাদ। দ্বৈত এসেছে দৈত্য থেকে। আপনার জেলার নাম আলিপুরদুয়ার রেখেছেন। ওটা পাল্টে দিতে হবে। আলি বিদেশি। অলি করে দিন। পুরো স্যাংসকিত! অলিপুরদুয়ার। রামপ্রসাদ তো গেয়েই গেছেন — 'অলির কথা শুনে বকুল হাসে'।

যাক গে! অদ্বৈত হল একা। আপনারা যখন একজনকে ভাল বলেন, তখন আরেকজনকে খারাপ করে দেন। যেমন, নেতাজি ভাল, জহরলালটা শয়তান! মার্কস মানলে গান্ধী মানবেনই না। যদি মোহনবাগান হন, তবে ইস্টবেঙ্গল কক্ষনো খেলতে পারে না। দু-জন একসঙ্গে ভাল বলা চলবে না। এটা হিন্দি সিনেমা থেকে আপনারা শিখেছেন। ক্যারেকটার মানেই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। এর থেকেই বোঝা যায় হিন্দি কেন ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ।

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম দুটো হয় না। যদিও বা দুটো হয় তবে দ্বিতীয়টাকে কখনোই ব্রহ্ম বলা যাবে না। ব্রহ্মের ধারণা কোথায় ছিল? হিন্দু ধর্মে। তাহলে হিন্দু ধর্মকে ব্রহ্ম করতে হলে তাকে অদ্বিতীয় করতে হবে। মানে, দ্বিতীয় আর কিছু থাকবে না। এটাই অদ্বৈতবাদের মূল কথা। সুতরাং, হিন্দু এক, রাম এক, অযোধ্যা এক, পলিটিক্স, দল এক, দলে এক। যে এটা মানবে না পাকিস্তানে গিয়ে থাকবে।

তাই বলি প্রিয় দেশাত্মচেতনায় উদ্বেল নাগরিকগণ! সবাই এক ভাবনায় আসুন। সবাই এক রকম ভাবুন। এতে শিল্পপতিদের সুবিধে হবে। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল, সবার পছন্দ এক হবে। হতেই হবে। এটা বিজ্ঞান। যে না হয় সে দেশের শত্রু। মনে রাখবেন, রিঅ্যাকশান একটা খারাপ জিনিস। রিঅ্যাকশান মানে সে ঢালাই হতে চাইছে না। অদ্বৈতের ছাঁচ থেকে আলাদা হতে চাচ্ছে। আমরা এক-এ বিশ্বাসী। এক কথায় বিশ্বাসী।

বিলিতি কেনার আগে দেখে নেবেন স্টিকার দিয়ে আইএসআই মার্কা দেওয়া হলোগ্রামযুক্ত তুলসীপাতা সাঁটা আছে কি না। আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গঙ্গোত্রীতে বিশেষ শুদ্ধিকরণ যজ্ঞ করে গঙ্গাকে শোধন করে দেওয়া হবে। তারপর বোতলে ভরে সবগুলো পোস্ট াপিস আর ইনকামট্যাক্স আপিসে পাঠিয়ে দেব। ব্যাঙ্কেও থাকবে। সেই জলে যে কোনও বিলিতি জিনিস শুদ্ধ করে নিলেই চলবে।

মনু বলেছেন, বউদের বাড়াবাড়ি ভাল নয় মানে, ভাল নয়। এক কথা। বেদে যা বলা আছে, পুরাণে যা লেখা আছে তারপরে আবার কথা কী?

তারমানে, দেশটাকে একটা ছকে না সাজালে আমরা এগোতে পারব না। দেশ মানে একধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক রঙ এবং একটাই রাষ্ট্রীয় দেবতা। তবে চাইলে কেউ শিব-মনসার পুজো করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মতে। কথায় বলে, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। ইউনিটির শুরুতেই আছে ইউনিট। মানে একক। অদ্বৈতবাদ! তারমানে, শঙ্করাচার্য সে-ই কবে কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন, ভাবুন?

তাই যে যার ঘর থেকেই শুরু করে দিন অদ্বৈতবাদের চর্চা। আপনাদে এলাকায় একটা জায়গার নাম দেখলাম 'জামালদহ'। আরে জামাল কী ভাবে সংস্কৃত হবে? ইতিহাস থেকে জামালদহের আদি সংস্কৃত নাম খুঁজে বের করুন। ওরাও তো বিলিত টালিগঞ্জের বদলে দেশি উত্তমকুমার এনেছে। আমরা তো বলি, ভাল কাজ। যদি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে বিত্তপ্রিয়া মর্মরস্থল করে দিতে পারেন, দু-হাত তুলে সাধুবাদ জানাব।

জানি, আপনাদের মন একটু প্রশ্ন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সেটা হল, মদ্যপানের ক্ষেত্রে বিলিতি বর্জন করবেন কি না? তা কেন করবেন? বিলিতিকে সার্টিফায়েড দেশি করা হবে। বিলিতি কেনার আগে দেখে নেবেন স্টিকার দিয়ে আইএসআই মার্কা দেওয়া হলোগ্রামযুক্ত তুলসীপাতা সাঁটা আছে কি না। আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গঙ্গোত্রীতে বিশেষ শুদ্ধিকরণ যজ্ঞ করে গঙ্গাকে শোধন করে দেওয়া হবে। তারপর বোতলে ভরে সবগুলো পোস্ট াপিস আর ইনকামট্যাক্স আপিসে পাঠিয়ে দেব। ব্যাঙ্কেও থাকবে। সেই জলে যে কোনও বিলিতি জিনিস শুদ্ধ করে নিলেই চলবে। শঙ্করাচার্য মদের ব্যাপারে কিছু বলেন নি। তবে, আমাদের মনে আছে যে বিশেষ একপ্রকার মদের নাম রাম। এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। দরকারে বাপের নাম বদলে দিচ্ছি, মদের পারব না?

ভক্ত নানা রকম হয়। কেউ ভগবানকে প্রেমিক ভাবেন, কেউ বন্ধু, কেউ সন্তান, আবার কেউ নিজেকে ভাবেন ভগবানের দাস। আমরা শেষেরটা চাই। সবাই ভগবানের স্লেভ হয় যান। ভগবানকে প্রভু ভাবুন। এর চাইতে বেশি আন্তরিক হওয়ার দরকার নেই। দাস হলে দেখবেন সব এক লাগছে। দাস হলে কোনও পছন্দ থাকবে না। ভিখিরির আবার পছন্দ কি? তখন যা পাবেন তাই নিয়ে খুশি থাকবেন। দেশ কী ভাবে চলছে না চলছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই হবে না। দেশ যে ভাবে রাখবে, সে ভাবে থাকবেন। আমরা অতীতে সবাই রাজভোগ খেতাম। দেশ খাওয়াত। সেই দেশকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ধন্যবাদ!

অনু ঘটক

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

জয় জল্পেশ।
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: দীপক কুমার হোড়,** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-9 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ তিনবিঘা-কোচবিহার।
৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার-জলদাপাড়া-বক্সা।
নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে,
ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ
যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK
Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch-evening snacks-dinner,
Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.